চোরডাকাত হাসিমজা

কুমার মিত্র

করুণাময়ী

প্রকাশক :
অমিতাভ সেনগুপ্ত
করুণাময়ী
১০৩, কালীকুণ্ডু লেন, হাওড়া-১

প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৫৫

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

বর্ণবিন্যাস : জুঁই সেনগুপ্ত

মুদ্রক : অনুলিপি প্রেস, হাওড়া -

প্রতিমা, নীলিমা, অণিমা, সরমা, মীরা ও সোমাকে --

মামাবাবু

সূচিপত্র

চৌরচরিত

ভেলাটায় জোর একটা লগির ঠালা মেরে পঞ্চানন বলল, 'যোগাড়-যন্ত্র করে বেরোতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। দুগ্‌গাবুড়ি কি আর এতক্ষণ জেগে আছে রে?'

ষষ্ঠীচরণ হাসল, 'পেটে খিদে থাকলে কেউ ঘুমোয়? খিদে নিয়ে তুমি ঘুমোতে পার?'

পঞ্চাননও হেসে ফেলল, 'তা কি পারি? রাজা, মহারাজা, সেনাপতি— কেউ পারে না। বোধহয় ভগবানও পারে না, বুঝলি ষষ্ঠী!'

'তাহলেই বোঝ। দুগ্‌গাবুড়ি ঠিকই জেগে আছে, আর ভাবছে তাদের ভগবানেরা এখনও এল না কেন। বুড়ি আমাদের দেখলেই বলে, 'তোমরা আমার ভগবান, দুঃখকষ্টের দিনে এসেছ। কথাটা শুনতে কিন্তু বেশ লাগে পঞ্চাদা। আঃ, একটু জোরে চালাও না ভেলাটা।'

পঞ্চানন ব্যাজার গলায় বলল, 'চেষ্টার কসুর করছি! ঘেমে নেয়ে গেলুম। ভেলা কি মেসিন যে ইচ্ছেমতো জোর দেওয়া যাবে! লগি ঠেলে ঠেলে হাত গেল। আজ আর ঘুমোবার সময় পাব না। প্রথমে দুগ্‌গাবুড়ি, তারপর একে একে আন্না ঠাকুমা, হারু বুড়ো, ছিধর দাদু— এতগুলো লোকের বাড়ি যেতে হবে। সব হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। এই করতে করতে রাত কাবার। রোজ রোজ এত চাল ডাল আনাজই বা পাই কোথায়? গাঁ-দিগারের সবই তো ভেসে গেছে রে। অথচ দেখ আমরা না দিলে ওদের দেখার কেউ নেই।'

ষষ্ঠীচরণ বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমার মাথায় হঠাৎ কেন যে এমন ভালমানষি জাগল ভেবে পাই না। এসব পোষায়? দেখ, আমরা এতদিন না বলে কয়ে লোকের জিনিস নিয়েছি। কোন দ্রব্য দেবার কথা ভাবিনি। তোমার মাথায় চাপল দেবার ভূত। বন্যা এলে মানুষ কষ্ট তো পাবেই। তা আমরা কি করব! নিজেদের পেট চালাতেই তো অস্থির। সে সব সোনার দিন কি আর আছে! যখন একবারটি বেরোলেই পায়ে পা দিয়ে বসে মাসখানেক দিব্যি খাওয়া চলত! এখন লোকজন সব সেয়ানা হয়ে গেছে। টাকাকড়ি বল, সোনাদানা বল, লোকের হাতে

বিস্তর। কিন্তু ছোঁবার উপায় নেই, এমনি সব ব্যবস্থাপত্তর করে রেখেছে। তাই বলছিলুম তোমার মাথায় ভূত চেপেছে।'

পঞ্চানন উদাস গলায় বলল, 'কার মাথায় কখন কি চাপবে বলা মুশকিল। আমিই কি জানতুম আমার ভেতর দয়াধম্ম বলে কিছু আছে! বন্যা-টন্যা তো লোকের ঘর খালি করার একটা ভাল মওকা। ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোরান যাবে ভেবে বান আসার পরের রাতে তো বেরুলুম একাই। তুই তখন ভিন গাঁয়ে গেছিস সাফাইয়ের কাজে। হারু বুড়োর বাড়ি মাঝরাতে গিয়ে পড়েছিলুম। বুড়ো ছাড়া কেউ নেই ভিটেয়। ছেলে-বৌরা সব উঁচু বাঁধে গিয়ে উঠেছে। দেখি বুড়ো ধুঁকচে। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, 'সারাদিন খাইনি, চাট্টি চাল এনে দিতে পার? মুড়ি হলেও চলবে।' তা বলব কি, বুড়োর কথা শুনে কান্না এসে গেল। সেই রাতেই বাড়ি ফিরে ঘর থেকে মুড়ি নিয়ে গেলুম। বুড়ো দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললে, 'আহা, বড় ভালো মানুষ তুমি। কোথায় থাক হে? বুঝলে বাবা, কাল থেকে ভগবানকে ডাকছি। তা দয়াময় আমার কথা শুনে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।' বুঝলি ষষ্ঠী, শুনে মনটা কেমন হয়ে গেল। এরকম ভালো ভালো কথা কেউ তো কোনদিন আমাদের বলেনি।'

ষষ্ঠীচরণ গজ গজ করতে করতে বলল, 'অমনি তুমি গলে গেলে। ব্যবসা লাটে ওঠাবে দেখছি। আমাদের পেশায় দয়ামায়া জিনিসটা খুব খারাপ, বুঝলে!'

পঞ্চানন কি বুঝল কে জানে, সে চুপ করে রইল।

ভেলাটা মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল গ্রামের দিকে। এখন আর মাঠ নয়, বানভাসিতে অথৈ সমুদ্দুর। বারো হাত লগিটার বেশির ভাগই ডুবে যাচ্ছে জলে। ফিন্ ফোটা জ্যোৎস্নায় কাছে দূরের গ্রামগুলো দ্বীপের মতো চোখে পড়ছে। দ্বীপগুলো এখন প্রায় নির্জন। শিশু, বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ মানুষ ছাড়া বাকি সব উঁচু উঁচু ডাঙা খুঁজে নিয়েছে। পাঁচ ছ'দিন আগে সন্ধের মুখে বাঁধ ভাঙল। হুড়মুড় করে গেরুয়া জল ঝাঁপিয়ে পড়ল চারদিকে। যে যা পারল নিয়ে ছুটল। যাবে আর কোথায়? সব আশ্রয় নিয়েছে প্রকাণ্ড উঁচু নদী-বাঁধের মাথায়। যাবার সময় কেউ কারো কথা ভাবল না। তখন মিনিটে মিনিটে জল বাড়ছে। ডুবে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, নিচু ভিটে। মেটে ঘরগুলো যেনো জলের ছোঁয়া পেয়ে ধুপ-ধাপ তাল পড়ার মতো পড়ে যাচ্ছে। উঁচু পোতাগুলোর কোমর জড়িয়ে ধরে জল উঠছে ওপর পানে। এমন সময়ে কেউ কি কারো কথা ভাবতে পারে! যারা পড়ে রইল তাদের দুর্দশার একশেষ। যাদের দেখাশোনার লোক আছে তারা মাঝে মধ্যে গাঁয়ে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুগ্‌গাবুড়ি কিংবা ছিবর ঠাকুর্দার মতো যাদের সাতকূলে কেউ নেই তাদের তো অনন্ত দুর্দশা।

পঞ্চানন হঠাৎ বলে উঠল, 'বুঝলি ষষ্ঠী, এই পৃথিবীতে সব্বাইকে কখনও কখনও ব্যাগার খাটতে হয়। আমরাও তাই খাটছি। আমার এই শিক্ষেটার গুরু কে জানিস?'

'কে?'

'ভগবান। তাঁর মতো ব্যাগার কেউ খাটে না। গোটা ছিষ্টির ভার ওঁরই ওপর কিনা। বেচারা দম ফেলার ফুরসৎ পর্যন্ত পায় না। আমাদের দু একদিন ঘুম হবে না বলে দুঃখ করছি, আর

ভগবান লোকটা কখনও ঘুমোতে পায় না। ঘুমোবার চান্স কোথায়?'

ষষ্ঠীচরণ বলল, 'ভগবানের বোধহয় ঘুমোবার দরকার হয় না। ভগবান কি মানুষ নাকি যে ঘুমোতে চাইবে? তুমি মাঝে মাঝে বড্ড হেঁয়ালি করে কথা বল পঞ্চাদা। ওসব আমার মাথায় ঢোকে না। এই যে ভগবান নিয়ে এত কথা বললে, তুমি জানো ভগবান মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে?'

'ব্যাটাছেলেরে বোকা, ব্যাটাছেলে। তোর একটুও শাস্তর জ্ঞান নেই। ধর না কেন মহাভারতের কেষ্টও তো ভগবান। তা কেষ্ট কি মেয়েছেলে?'

'তা বটে। সত্যি, তুমি অনেক কিছু জানো পঞ্চাদা। গুরুদেব লোক মাইরি।'

কথা বলতে বলতে ভেলাটা উঁচু ভিটের কোলে এসে ভিড়ল। ভিটে আর হাত খানেক জেগে আছে। বন্যার জল আর একটু উঁচু হলে দুগ্‌গা বুড়ির কুঁড়েঘর গলে ফ্যান হয়ে যেত। পঞ্চানন আর ষষ্ঠীচরণ দুজনে দুটো পুঁটলি হাতে নিয়ে ভিটের উপর উঠে এলো। সামনেই একটা মেটেবাড়ি। সামনে এসে দাঁড়াতে ভিতর থেকে ক্ষীণ গলা ভেসে এলো, 'কারা গো?'

পঞ্চানন সাড়া দিল, 'আমরা ঠাকুমা। দরজা খোলো।'

হুড়কো খুলে বেরিয়ে এলো দুগ্‌গাবুড়ি, 'অ, তোমরা! বুড়ির কথা মনে রেখেছ বাবারা! আমি বলি বুঝি ভুলেই গেলে।'

'ভুলিনি। যোগাড়– যন্তর করতে দেরি হয়ে গেল। সহজে কি কিছু পাওয়া যায়! এই চালগুলো রাখো। দুটো আলুও আছে। দু একদিন চালিয়ে নাও আবার আসব পরে।'

দুগ্‌গাবুড়ি বলে, 'এই তো এলে বাছা। একটু জিরোও না। গাঁয়ের খবর-টবর বলো।'

পঞ্চানন শশব্যস্তে বলল, 'একটুও সময় নেই ঠাকুমা। তাড়া আছে। আরো দু' তিন জায়গায় যেতে হবে। তারা পথ চেয়ে আছে।'

পঞ্চানন মাঝে মাঝে ভালো বাংলা বলে। এক সময় সে তরজা গাইত। সাধু ভাষা মিশিয়ে দিয়ে ছড়া বাঁধত। অভ্যেসটা রয়ে গেছে।

বুড়ি বলল, 'বলি তোমাদের খাওয়া দাওয়া জুটছে তো! নাকি আমাদের মতো অনাথ-অভাগীদের দিতে গিয়ে নিজেদেরই পাত ফাঁকা যাচ্ছে! চৌপর রাত বাড়ি বাড়ি খোঁজ নিয়ে বেড়াবে! ভালো কথা, কিছু খেয়ে দেয়ে বেরিয়েছ তো! নইলে বল ভাতে ভাত চড়িয়ে দিই, নাতি ঠাকুরমা এক সঙ্গে বসে খাওয়া যাবে।'

ষষ্ঠীচরণ একগাল হেসে বলল, 'আমরা [illegible]ড়ি খেয়ে বেরিয়েছি। রাতে আমরা ভাত খাই না, ভাতের নেশায় ঘুম ধরে যায়। আর ঘুম ধরলে আমাদের চলে না। রাতখাঁটা লোক তো।'

'সে কী বাছা, রাতে ঘুমোও না! তাহলে কি কর?'

ষষ্ঠীচরণ সতর্ক হয়ে গেল। পঞ্চানন একটা জোর চিমটি কেটেছে গায়ে। সে 'উঃ' করে উঠল। ষষ্ঠীর বেশি কথা বলা একটা বদরোগ। কথার নেশায় পেয়ে বসলে নিজেকে সামলাতে পারে না। পঞ্চানন সাবধান করে দিলেও ষষ্ঠীচরণ বলে বসল, 'আমরা হচ্ছি প্যাঁচার জাত।

রাতে বেরোই।'

দুগ্‌গাবুড়ি সাদামাঠা মানুষ, সাবেক কালের লোক। ষষ্ঠীচরণের কথার মারপ্যাঁচ ধরতে পারল না। শুধু বলল, 'তোমারা বাছা কারা তাও জানি না। কোত্থেকে আসো তাও জানি না। তা অতো জানাজানিরই বা কি দরকার? নাতি ঠাকুমার সম্পক্ক হয়েছে তা সে যেভাবেই হোক। তা বলি কি বাছারা, তোমরা একদিন দুপুর বেলা না হয় এস। রাঁধাবাড়া করব, তোমাদের পাত পেড়ে খাওয়াব। তোমাদের জিনিসই তোমাদের খাওয়াব। আমার বড় শখ। সাতকূলে নাতিপুতি কেউ তো নেই, তোমরাই আমার নাতিপুতি।'

বলতে বলতে বুড়ি কেঁদে ফেলে। পাছে আটকে যায় সেই ভয়ে পঞ্চানন বলে ওঠে, 'এখন আর কথা বলার সময় নেই। পারলে একদিন আসা যাবে দুপুরবেলায়।'

ভেলা ঠেলতে ঠেলতে পঞ্চানন বলল, 'বুঝলি ষষ্ঠী, শুধু নিয়ে নয়, মানুষকে দিয়েও সুখ আছে।'

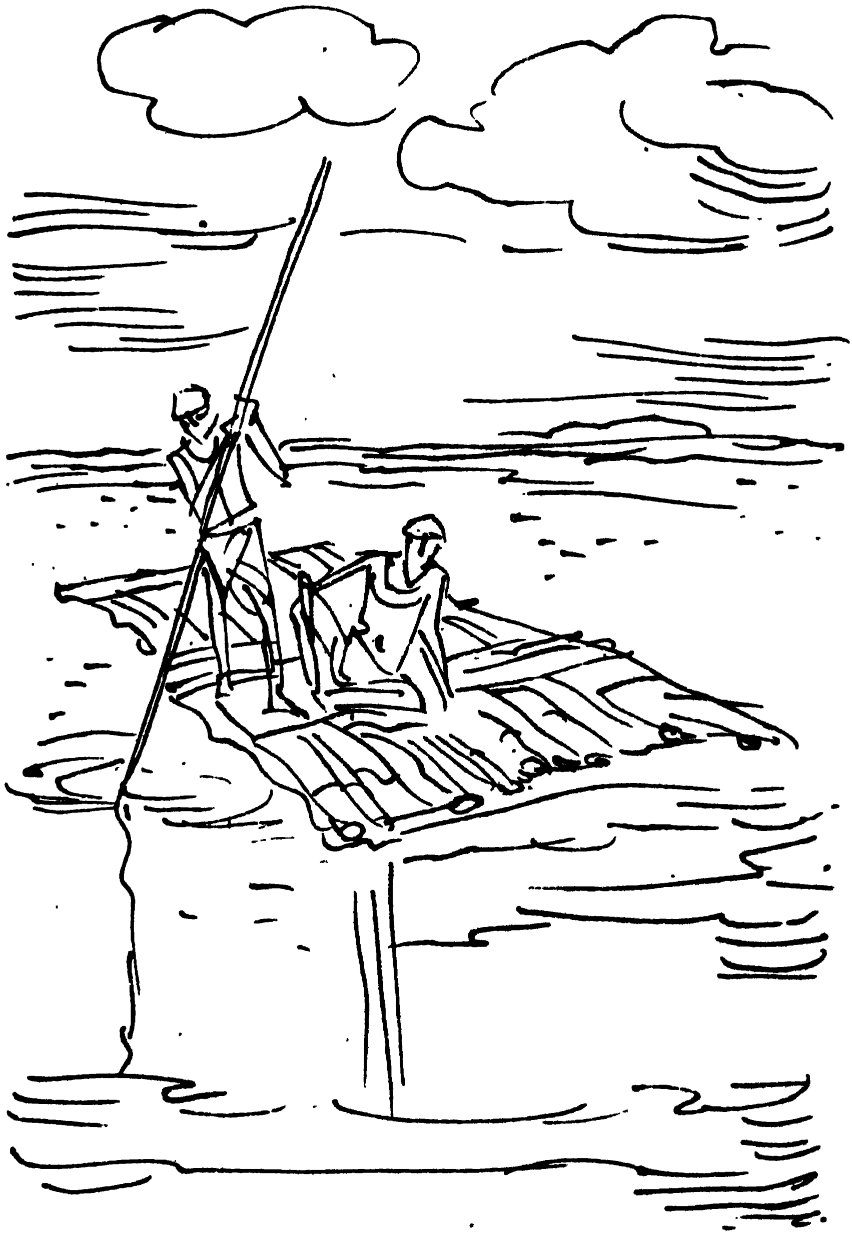
ষষ্ঠীচরণ বলল, 'বুড়ির কথায় তোমার মনটা খুব ভিজে গেছে, না পঞ্চাদা?'

'ঠিক ধরেছিস। একদিন দুপুরে আসতে হবে। ঠাকুরমার খুব রেঁধে খাওয়ানোর শখ। আসবি তো?'

ষষ্ঠীচরণ চিন্তিত গলায় বলল, 'তোমার যখন ইচ্ছে আসব। কিন্তু কাজটা খুব ভালো হবে না। আমরা রাতের জীব, দিনের বেলা কাকে ঠোকরাবে। তোমার কবে থেকে এত মায়ার শরীর হল তাই ভাবছি। সুবিধে ঠেকছে না ব্যাপারটা।'

পঞ্চানন উত্তর দিল না। ষষ্ঠীর কথাগুলো সে যেন শুনতেই পায়নি।

সাংঘাতিক বানভাসির মধ্যে পাশাপাশি কুশবেড়ে আর শীতলচকের তিনটে বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। সামান্য চুরি। কোথাও এক হাঁড়ি চাল, কোথাও এক বস্তা আলু, কোথাও বা এক টিন মুড়ি। চুরির মধ্যেই গণ্য নয়। কিন্তু বানের দুর্দিনে এগুলোই আবার মস্ত চুরি। গায়ের গয়না গেলেও দুঃখ নেই, কিন্তু চাল, আনাজ চুরি গেলে বুকে বাজবে। সুদিন এলে গয়না হবে, মুখের খাবার চুরি গেলে গেরস্থ বাঁচবে কি করে? কুশবেড়ের দু বাড়িতে চুরি হবার পর শীতলচকের লোকেরা একটু সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। এ গ্রামের ফয়েজ আলির বাড়িতে চুরির সময় চোরদের প্রায় ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। হ্যাঁ, চোর একজন নয়, দুজন। ফয়েজ আলি অবস্থাপন্ন চাষী। ধানী জমি, রবি শস্যের জমি বিস্তর। উঁচু পোতার ওপর বাড়ি, ডোবেনি। রাত তখন বেশি হয়নি, এই নটা দশটা। তার মধ্যেই গ্রামে নিশুত রাতের আমেজ। ফয়েজ আলির চাচী রাতের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে গোয়ালে গিয়েছিল গরুকে জল দিতে। হঠাং নজরে পড়ল মস্ত আমড়া গাছটার তলা দিয়ে কারা যেন যাচ্ছে চুপিসাড়ে। 'কারা গো?' চাচী শুধলো চেঁচিয়ে। সাড়া নেই। 'বলি যাচ্ছে কারা?' না, এবারও সাড়া নেই। চাচীর সন্দেহ বাড়ল। 'চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই সলতে সলতে চেহারার দুজন মানুষ সাঁই সাঁই করে ছুটল। একজনের মাথায় একটা ছোটখাট বোঝা। 'চোর' শব্দটার মহিমা এমন যে আশেপাশে যারা আছে তারা আনাচ-কানাচ দিয়ে ছুটে আসবেই। এলও তাই। কিন্তু লোক তো আর বেশি



নেই। পাড়া তো ফাঁকা। চোর দুটো তাই রক্ষা পেয়ে গেল। ভিটের নিচেই জল। সেখানে ভেলা বাঁধা ছিল। তাতে চড়ে পলকে হারিয়ে গেল লোকগুলো। কেউ কিছু করতে পারল না, চেঁচানই সার। ছুটে গিয়ে যে ধরবে সে উপায় তো নেই। চারদিকে যে অথৈ সাগর।

ছ'মাইল দূরে থানা। খবর দেওয়া অনেক হ্যাঁপার ব্যাপার। তবু কি করে যে খবর গেল কে জানে। কিন্তু গেল খবর। পুলিশ এল। জোর তল্লাশি চলল। কিন্তু কিস্যুটি হল না।

শীতলচকের সীমানা থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাঁধের কোলে ভেলা বেঁধে সন্ধের আবছায়ায় বেলগাছের নিচে বসে বিড়ি টানছিল পঞ্চানন আর ষষ্ঠীচরণ। খিক্ খিক্ করে হাসছিল দুজনে।

ষষ্ঠী বলল, 'পুলিশ ব্যাটারা পালিয়েছে নিশ্চয়। ঘোরাঘুরিই ওদের সার। তবে সেদিন কিন্তু খুব বেঁচে গেছি পঞ্চাদা। আর একটু হলে ধরে ফেলত। বুড়িটা যে এমন চেঁচিয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি। তিন তিনটে চুরির পর লোকজন এখন সজাগ হয়ে গেছে। পুলিশও আসা-যাওয়া করছে। আমাদের দিনকতক গা ঢাকা দেওয়া দরকার। গরম হাওয়াটা কাটুক। তারপর ফিরে আসা যাবে।'

পঞ্চানন হুসহুস করে দুবার বিড়িতে টান দিয়ে বলল, 'খাবটা কোথায়? কে আমাদের জন্যে ভাত নিয়ে বসে আছে?'

'আমার পিসিমার দেশটা ডোবেনি। প্রায়ই যেতে বলে। এই মওকায় ঘুরে আসা যাবে। পিসি লোক ভালো। বাড়ির অবস্থাও ভালো। তোমাকে নিয়ে গেলে অখুশি হবে না। বলব তুমি আমার বন্ধু। রাজি?'

'একটু ভাবতে দে। অনেকগুলো মানুষ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের ব্যবস্থা করতে হবে তো। মাল যা এখনও স্টক আছে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আচ্ছা পঞ্চাদা তুমি হঠাৎ এমন পরমহংস হয়ে উঠলে কেন বলত? কিছু মাথায় আসছে না মাইরি। বন্যা এসেছে, যত দায় যেন তোমার।'

পঞ্চানন হেসে বলল, 'তুই বা কম পরমহংস কিসে? আমাকে ছেড়ে যেতে পারছিস না, সঙ্গে লেগে আছিস। তবে অবিশ্যি মন্দ কথা বলিসনি তুই। দিন কতক গা আড়াল হওয়াই দরকার। তবে ভাই একটা কাজ যে বাকি রয়ে গেল।'

'কি কাজ?'

'দুগ্‌গাঠাকুমা যে খুব আশা করে আছে আমাদের পাত পেড়ে খাওয়াবে। বুড়ি মানুষের ইচ্ছে মিটিয়ে ফেলাই ভালো, কি বলিস! হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। কাল দুপুরেই হয়ে যাক। কেমন?'

'হোক, তুমি যখন বলছ।'

দুগ্‌গাবুড়ির হাতের রান্না সত্যিই অমৃত। কলার পাতায় গরম ভাত। রাঙা- রাঙা ঝাল-ঝাল তরকারি। পুঁটি মাছের ঝালচচ্চড়ি। পঞ্চানন আর ষষ্ঠীচরণ সহাস শব্দ করে খাচ্ছিল।

'খাও তোমরা বাছারা, পেট ভরে খাও।' স্নেহগভীর দৃষ্টিতে বুড়ি তাকিয়েছিল ওদের

পাতের দিকে. 'তা তোমরা খাচ্ছ কেমন বাছারা? রান্না ঠিক হয়েছে?'

'অমৃত একেবারে। অনেক কাল এমন খাইনি। খাওয়াবেই বা কে?' পঞ্চানন সনিঃশ্বাসে বলল।

'বাড়িতে কেউ নেই বুঝি? ঘর সংসার করনি?'

'না ওসব রাস্তায় আমরা নেই।'

একথা শুনে বুড়ি যখন 'আহা', 'আহা' বলে দুঃখপ্রকাশ করছে, সেই সময়ই ঘটল ব্যাপারটা। পঞ্চাননরা যখন খাওয়ায় মেতে আছে সেই সময় যে দুটো ভেলা এসে ভিটের গায়ে ঠেকেছে তা ওরা নজরই করেনি। নজর যখন করল তখন আর পালাবার রাস্তা নেই। খাকি উর্দিপরা সাত জন লোক ঘিরে ফেলেছে ওদের। একজনের কোমরে পিস্তল, দুজনের কাঁধে রাইফেল, তিনজনের কাছে রুল কাঠ।

পিস্তলধারী সোজা এসে এক হ্যাঁচকায় পঞ্চাননকে টেনে তুলল। ষষ্ঠীচরণকে অন্যজন। ব্যাপার দেখে দুগ্‌গাবুড়ি হাউমাউ করে উঠল, 'এ তোমাদের কিরকম আক্কেল বাছা? মানুষ খেতে বসেছে তাকে অমন করে পাত থেকে তুলতে হয়?'

'ওরা তোমার কে হয়?' শুধলো পিস্তলধারী।

'ওদের সঙ্গে আমার নাতি ঠাকুরমা সম্পর্ক।'

'জানো ওরা কে? ওরা হচ্ছে দাগী চোর পঞ্চু-ষষ্ঠী। নজর রাখা হয়েছিল ওদের ওপর।'

দুগ্‌গাবুড়ি যেন খন্‌ খন্‌ বেজে উঠল, 'ওরা চোর না সাক্ষাৎ ভগবান! এই দশ দশটা দিন কারা আমার খোঁজ-খবর রাখলে? মুখের ভাত জোগালে? তোমরা তখন কোথায় ছিলে দারোগাবাবু? চোর ফলাচ্ছ। চোর কে নয়, অ্যাঁ!' সত্তর-পঁচাত্তর বছরের বুড়ির রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে দারোগা দুহাত পিছিয়ে গেল।

তবে বুড়ির সার্টিফিকেট যত জোরালই হোক, পুলিশ তার কর্তব্য করতে ছাড়ল না।

বানের জল অনেকখানি কমে এসেছে। রাস্তাঘাট কিছুটা জেগে উঠেছে। কোমরে দড়ি বেঁধে দুই মূর্তিকে নিয়ে কাদা ভাঙতে ভাঙতে পুলিশরা চলেছে কোম্পানী বাঁধের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চানন বলল, 'আমার দোষে তুইও ধরা পড়লি। খুব কষ্ট হচ্ছে না রে ষষ্ঠী?'

ষষ্ঠীচরণ বলল, 'তোমার?'

পঞ্চানন কেমন উদাস গলায় বলল, 'সত্যি বলছি, একটুও কষ্ট হচ্ছে না, দুগ্‌গাপিসি কত যত্ন করে খাওয়ালে বলত! জানিস এমন যত্ন আত্তি আমাকে কেউ কোনদিন করেনি। যেন নিজেরই ঠাকুরমা।'

দড়িধরা সেপাইটা এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিল বলল, 'খুব আদিখ্যেতা হচ্ছে না?'

পঞ্চানন কিছুক্ষণ খুব অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আদিখ্যেতা! না তো। তুমি কখনোও কারো ভালো করনি না? তাহলে আমাদের কথা বুঝবে না।'

সেই অচেনা লোকটা

ভরদুপুরেই গোয়ালঘর থেকে তিনটে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পানু। ওর বড় মাছ ধরার নেশা। ডহর মাঠের মজা খালটায় বিস্তর মাছমাছালি। শোল, ল্যাঠা, পুঁটি, খলসে, কই। টপাটপ ওঠে বঁড়শিতে। এখন তো স্কুলের ছুটি, পড়ার চাপ নেই। আর দুপুর বেলায় বড়দের মতো সে ঘুমোয় না। দু'একদিন ঘুমিয়ে দেখেছে, কোন মজা নেই। অথচ ছিপে মাছ ধরায় কী মজা! আসলে মাঠঘাট, জলা-জঙ্গল, নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতে দারুণ ভাল লাগে তার। নেশার মতো পেয়ে বসে। তবে হাতে কিছু না কিছু থাকা চাই। কখনও ছিপ, কখনও গুলতি। কখনও স্রেফ বাঁশি।

বাড়ি থেকে মজা খালটা অনেক দূরে। অন্তত মাইলখানেক। মাঠের সড়ক বরাবর তুমি চলেছ তো চলেছই। তবে পানুর মতো বাচ্চা ছেলের আর কষ্ট কি! মাঠে নামলেই সে হরিণ হয়ে যায়। দুদ্দাড় হাঁটে। কখনও দম টেনে নিয়ে মুখে চু-উ-উ শব্দ তুলে দৌড়য়। লহমায় এসে যায় শরগাছ, ঘাস আর হোগলায় ঢাকা মজে-যাওয়া খালটা।

আসলে পানুদের গ্রাম থেকে সব কিছুই বড় দূরে দূরে। হবারই কথা। তাদের গ্রামের চারিদিকে শুধু বড় বড় মাঠ কিনা। নি-নি করছে প্রান্তরের অকূল বিস্তার। বাঁদিকে ওই যে গ্রামটা ঝাপসা-ঝাপসা দেখাচ্ছে ওখানে তার বাবা বাজার করতে যায়, ডানদিকে আড়াই মাইল পেরোলে তবে তাদের স্কুল, আর একদিকে দু'ক্রোশ গেলে তবে বড় গাঙ্—এইরকম আর কি! মজা খালটাও দূরে হওয়াতে সুবিধেই হয়েছে পানুর। আশপাশে লোকজন থাকে না। বেশ একমনে মাছ ধরা যায়।

এখন সেখানে বসে। সেখানে পৌঁছে কেঁচো-গোবরের চার ফেলে দিয়ে, বোলতা টিপির টোপ গেঁথে, ছিপ হাতে নিয়ে বসল পানু। সবে একটা বড়সড় কই গেঁথে খালুইয়ে রাখতে

যাচ্ছে -একটা গোঙানির মতো আর্তনাদ কানে ভেসে এল তার। 'আঃ-আঃ- উঃ, মাগো!' মজা খালের হোগলার জঙ্গলের ভিতর থেকে উঠে আসছে শব্দটা। কে যেন গভীর যন্ত্রণায় কাৎরে কাৎরে উঠছে। পানু চমকে উঠল। হাত থেকে পড়ে গেল ছিপটা। তাদের স্কুলের বাংলা-স্যার 'লোমহর্ষক' কথাটা বারবার ব্যবহার করেন। কাতরানির আওয়াজটা যেন সেইরকমই। বিশেষ করে এই ফাঁকা মাঠে, নির্জন খালের ধারে।

খাল-বরাবর এদিক-ওদিক ভয়ে ভয়ে তাকাল পানু। না, কেউ কোথাও নেই। শুনশান মাঠে শুধু হাওয়ার শব্দ। ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি! পানিভূতের কাণ্ড? দুপুরবেলাটা নাকি সময় হিসেবে খারাপ। ঠাকুমা বলে---দুক্কুর বেলা ভূতেরা ঢেলা ছোঁড়ে। তবে ভূতে সে বিশ্বাস করে না। অবিশ্যি সেটা বাড়িতে। ফাঁকা মাঠে এলে কেমন যেন মনে হয় ভূত বলে কিছু হয়তো আছে। তাহলে তারাই কি ভয় দেখাচ্ছে পানুকে একলা পেয়ে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল মজা খালের পেটের মধ্যে লম্বা-লম্বা হোগলার জঙ্গলটা নড়ছে। শেয়াল-টেয়াল? উদ্‌বেড়াল? পানুর চোখ স্থির হয়ে সেঁটে রইল জায়গাটার ওপর।

তারপর সে অবাক হয়ে দেখল জঙ্গলের ভিতর থেকে বুকে হেঁটে একটা মানুষ বেরিয়ে আসছে। প্রথমে মাথা, তারপর বুক, শেষে বাকি শরীরটা ডাঙায় উঠে এল। লোকটার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি, চুল উস্কোখুস্কো, গায়ের রঙ তামাটে, গায়ে ভিজে গেঞ্জি, পরনের খাটো ধুতিটা ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। শরীরের কাঠামোটা শক্তপোক্ত হলেও এখন যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে আছে।

পানু ভয়ে জমে গেল যেন।

ভাব ব্যাপারটা। কেউ কোথাও নেই—না জনমনিষ্যি, না কিচ্ছু, তার মধ্যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ বেরিয়ে এল মজা খালের মধ্য থেকে। আবার এমন একটা মানুষ যাকে আগে কখনও দেখেনি পানু। এতে তার বুক ধড়ধড় করতেই পারে। করছেও। তবে মানুষটার চেহারা এমন কিছু ঘটোৎকচ কিংবা জরাসন্ধের মতো নয়। বলতে কি অনেকটা তার বাবার মতোই। বয়সটাও প্রায় একই রকম। কিন্তু মতলব কি লোকটার? জলে-জঙ্গলে লুকিয়ে করছিল কি? কোন বদ মতলব নেই তো? ছেলেধরা নাকি? কিন্তু পানু নামের ছেলেটাকে তো চেনে না। একবার ছুট লাগালে তাকে পায় কে? তাকে ধরা ওই আধবুড়ো লোকটার কর্ম নয়।

লোকটা কিন্তু তাকে ধরবার চেষ্টাই করল না। কোনরকমে উঠে বসতে গিয়ে যন্ত্রণায় ওর চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল। হাতছানি দিয়ে ডেকে বলল, 'খোকা শোন। তোমার ভয় নেই, আমি কিছু করব না। করবার ক্ষমতাও নেই। দেখছ না, মরতে বসেছি।'

পানু একবার ইতস্ততঃ করে এগিয়ে গেল। লোকটা খুব কষ্ট পাচ্ছে, সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছে। পানু কাছে এসে দেখল লোকটা দু'হাতে হাঁটুর ওপরের অংশটা চেপে ধরে আছে। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ক্ষত হাঁ করে আছে। ধারাল অস্ত্রের কোপ পড়েছে মনে হয়।

আহত জায়গাটার আশপাশ ফুলে ঢোল।

পানু বলে উঠল, 'ইস্। এ কি! হল কি করে?'

লোকটা বড় দুঃখের মধ্যেও হাসল, 'আমাদের তো শেষমেষ এরকমই দশাই হয়। আমি কোন্ গ্রামের লোক আর কোথায় মরতে এসেছি! ছেলেমেয়েরা বাপের মরার খবরটাও পাবে না।'

'বাঃ, মরবে কেন? কি হয়েছে তোমার? চোট লাগল কি করে?'

'কেন মরব বুঝতে পারছ না? প্রায় বারো ঘন্টা ওষুধ পড়েনি। ঘা পচে বিষিয়ে গেছে। ডাক্তার দেখাতে পারলে হয়তো বাঁচতুম। তা ডাক্তার কোথায়?'

পানু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আছে। কাশ্যপপাড়ায়। মাইল তিনেক দূর পড়বে। যাবে সেখানে?'

'এক পা হাঁটার ক্ষমতা নেই। তিন মাইল? তার চেয়ে স্বগ্‌গো বরং কাছে। তবে আমার মতো লোক কি আর স্বগ্‌গে যাবে? যাবে নরকে। পাপের লিখন খণ্ডানো যায় না, বুঝলে খোকা!'

কথাগুলোর মধ্যে কি যেন একটা ছিল। কিসের একটা ইঙ্গিত। পানুর চোখ বড়বড় হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি কে?'

'আমি কে বল না।'

'তুমি ডাকাত।'

লোকটা কেমন চমকে উঠল। বলল, 'কি করে জানলে?'

'বাবা বলছিল। বাজার করতে গিয়েছিল মইনানে। ওখান থেকে শুনে এসেছে মইনানে কাল রাতে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। বাড়ির কর্তা খুন হয়ে গেছে। একজন ডাকাতকে কেটে ফেলেছে গ্রামের লোক। আর এক ডাকাতের সাংঘাতিক চোট। সেই নাকি দলের সর্দার। তবে সে চোট নিয়েও ভেগে পড়েছে। গ্রাম পুলিশে ছয়লাপ। লোকও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। তাহলে তুমিই সেই লোকটা। অ্যাদ্দূর কোনরকমে এসে মজা খালে লুকিয়ে আছ।'

লোকটা এবার খুব নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'তাহলে সবই তো বুঝতে পেরেছ। তোমার নাম কি?'

'পানু।'

'তা পানু, তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দেবে? পুলিশে খবর দিলে বক্‌শিসও পেয়ে যেতে পার।'

পানু কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর ডাঁয়ে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ল। না, সে ধরিয়ে দেবে না। কিন্তু কেন সে ধরিয়ে দিতে রাজি হল না সে নিজেও জানে না।

পানু নিজের মনে ব্যাপারটা ভেবে নিল একবার। এই লোকটা মইনানে ডাকাতি করতে

গিয়েছিল। গ্রামবাসীরা ওদের ঘিরে ফেলে। লোকটা বল্লম কিংবা কাটারির ঘায়ে আহত হয়। তারপর সেই অবস্থাতেই পালাতে শুরু করে। মূল রাস্তা ছেড়ে মাঠের পথ ধরে। এক সময় জলপোকার কামড়ে ওর গা ডুমো ডুমো হয়ে ফুলে উঠেছে। রক্ত ঝরে ঝরে মুখখানা ফ্যাকাশে। লোকটার পেটে বোধহয় পনেরো-ষোল ঘন্টা দানাপানি পড়েনি।

লোকটা গোঙাচ্ছে। ওর আঃ-উঃ শুনে পানু ওর দিকে তাকাল। বলল, 'আজ আর মাছ ধরায় মন আসছে না। বাড়ি যাব।'

চমকে উঠে লোকটা বলল, 'বাড়ি যাবে। বাড়ি গিয়ে সবার কাছে আমার কথা বলে দেবে তো? বলবে তো—একটা ডাকাত খালের ধারে আধমরা হয়ে পড়ে আছে, নড়া-চড়ার ক্ষমতা নেই! বলবে আর অমনি গোটা গ্রাম আমার ওপর চড়াও হবে। তারপর পিটিয়ে মেরে ফেলবে। আজকাল আকছার ওরকম হচ্ছে। আমার দলের বিশু, রংলাল, ওসমান ওভাবেই তো মারা পড়েছে।'

পানু আবার ঘাড় নাড়ল। গ্রামে গিয়ে কাউকে সে কিছু বলবে না।

'বড্ড খিদে—কতদিন যেন কিচ্ছু খাইনি। তবে জলের ঝামেলাটা নেই। খালের জল রয়েছে। বারকতক তো খেয়েছিও। তোমাদের গ্রামটা কদ্দূরে পানু?'

পানু গ্রামের দিকে আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই যে ওইটা। বাড়ি থেকে মুড়ি-টুড়ি এনে দোব? যাব আর আসব। সন্ধের আগেই এসে পড়ব। তুমি ততক্ষণ খাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাক। কেউ এদিকে এসে পড়লে রেহাই নেই।'

এই বলে, কথা না বাড়িয়ে, ছিপ গুটিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল। মুড়ির পুঁটলি নিয়ে যখন ফিরে এল তখন সন্ধের ঘোর লাগতে শুরু করেছে। ওকে দেখে খাস থেকে উঠে এল লোকটা। পানু সত্যি সত্যি ফিরে আসবে ভাবতে পারেনি। বরং আশঙ্কা ছিল পানু ব্যাপারটা পাঁচকান করে দেবে, আর রাশি রাশি মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে আসবে।

বলল, 'তুমি খুব ভাল ছেলে পানু। তোমার খুব দয়া।'

পানু হেসে ফেলল। বড়দের মুখে এরকম কথা শুনলে একটা বাচ্চা ছেলের হেসে ফেলবারই কথা। বলল, 'দয়া থাকা ভাল বলছ? তাহলে তোমার কেন দয়া নেই গো? তুমি ডাকাত—তোমার তো দয়ামায়া নেই।'

'নেই। থাকলে চলে না।'

'ডাকাত হতে গেলে কেন?'

'পেটের দায়ে। লোভে।'

'কখনও মানুষ খুন করেছ?'

'আমাদের কাজে খুন করতে হয়, খুন হতেও হয়।'

'ইস্, ছিঃ-ছিঃ। মানুষ খুন করা খুব খারাপ। তুমি খারাপ লোক। খুনী। তোমাকে ধরিয়ে

দেওয়া উচিত।'

লোকটার চোখ ভয়ে গোল গোল হয়ে উঠল, 'এই যে বললে কারো কাছে বলবে না আমার কথা!'

'বলব না-ই তো। আমি বলছি উচিতের কথা। ধরিয়ে দোব বলিনি। তুমি বোধহয় তেমন লেখাপড়াটড়া জানো না, তাই না!'

'হুঁ, আমার লেখাপড়া! একেবারে গোমুখ্যু।'

'রাত হয়ে আসছে। জলে থাকলে অসুখ হয়ে মারা যাবে। সাপ খোপেও কাটতে পারে। তুমি বরং এক কাজ কর। খানিকটা যেতে পারবে? ওই যে খানিক দূরে চাষীদের কুঁড়েটা দেখা যাচ্ছে — ওখান পর্যন্ত? এখন তো ফসল উঠে গেছে, কুঁড়েতে কেউ থাকে না। কুঁড়েটায় দিব্যি রাত কাটানো যায়। যাবে?' পানু বলল।

'যাব কি করে? উঠে বসতেই তো পারছি না।'

'আমি ধরে নিয়ে যাব। আমার কাঁধে ভর রাখবে। কুঁড়েটা তো বেশি দূরে নয়।'

'তোমার গায়ে আর জোর কতটুকু?'

'বারে, আমার গায়ে জোর নেই বুঝি? আমার কত দম জানো? এক ডুবে প্রকাণ্ড শিবপুকুরটা পার করি। আধ মণ ধান হুই বাজিতপুরের ধানকলে নিয়ে গিয়ে ভানিয়ে নিয়ে আসি।'

পানুর গায়ে সত্যিই জোর আছে। যেভাবে সে অন্তত দুশো গজ লোকটাকে যেতে সাহায্য করল তা অনেক বড় মনিষ্যি পারে না। লোকটা কুঁড়ের ভেতর ঢুকলে পানু বলল, 'মুড়ি-টুড়ি-গুলো খেও। ভোরে আসব। জল আর রুটিগুড় নিয়ে। ভেতরে একটা লাঠিমতো আছে দেখছি। শেয়াল - টেয়াল আসতে পারে। লাঠিটা তখন কাজে লাগবে। ঘেয়ো গন্ধ পেলে শেয়াল লাগে, জ্যান্ত মানুষকেই তখন ওরা ছিঁড়ে খায়। ও ডাকাতদাদা, আমি চললুম এখন। রাত হয়ে গেছে।'

রাতটা কেমন করে কাটল পানুর সে তার কহতব্য নয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পেল বাবা ভাত খেতে খেতে মায়ের সঙ্গে মইনানের ডাকাতির গল্প করছে। চোট পেয়ে পালিয়ে যাওয়া ডাকাতটা এখনও ধরা পড়েনি। কেউ ধরিয়ে দিলে পুরস্কার পাবে। ও নাকি সাংঘাতিক ডাকাত। লোকে বলে কেদার সর্দার। অনেক খুনজখম করেছে। পানু মনে মনে ভাবল — কুঁড়েয় রেখে এল যাকে সেই লোকটাই কি কেদার ডাকাত? তার বাবা কি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারবে যে লোকটাকে নিয়ে চারদিকে তোলপাড় চলছে সেই লোকটাকে সে ইচ্ছে করলেই ধরিয়ে দিতে পারে এবং পুরস্কার নিতেপারে? ধরিয়ে দেবে নাকি? নিজেকে প্রশ্নটা করেই পানু মনে মনে বলল, 'না, ছিঃ-ছিঃ। লোকটা যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, ওষুধ পড়েনি, মাঠেঘাটে পড়ে আছে। ওর খোঁজ পেলে মানুষ তো এমনিই ওকে মেরে ফেলবে। মানুষ বড় বজ্জাত, বদরাগী, হিংস্র।'

সারারাত আধো ঘুমে আধো জাগরণে কাটিয়ে, অনেক দুঃস্বপ্ন দেখে, শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল পানু। ঘুম ভাঙতে লাফিয়ে উঠল। ভোর আর নেই, ফর্সা হয়ে এসেছে চারদিক। ইস্, আর একটু আগে ঘুম ভাঙলে ভাল হত। তবু রুটির প্যাকেট আর দড়িবাঁধা ঘটিটায় একঘটি জল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল পানু।

মাঠে এসে অনেকটা দূর থেকেই পানু দেখতে পেল কুঁড়েটার কাছে ভিড় জমেছে। চ্যাঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। ওর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। নির্ঘাৎ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। তাহলে কি সে বাড়ি ফিরে যাবে?

পানু কিন্তু বাড়ি ফিরল না। রুটি আর জলের ঘটি একটা শুকনো ডোবার মধ্যে ঘাসপাতায় চাপা দিয়ে সে কুঁড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

লোকটা কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। মরার আগে কবুল করেছে ওর নাম কেদার সর্দার। তার পরেই কিছু ভয়ঙ্কর লোক পিটুনি শুরু করে। আধমরা হয়েই ছিল, তাই মরতে বেশি সময় লাগেনি। হাতের সুখ করে ধোলাই দিতে পারেনি বলে একজন আফশোস করছিল।

কুঁড়েয় উঁকি মেরে পানু দেখল মুড়ির পুঁটলি যেমনকে তেমন পড়ে আছে। লোকটা একমুঠো মুড়িও মুখে তোলেনি। লোকটার মুখে রক্ত জমে আছে। চোখ দুটো ভয়ে-যন্ত্রণায় বড় বড় হয়ে আছে।

পানু ভিড়ের কাছ থেকে সরে এল।

একজন খুনে ডাকাত মরে গেছে তো কি হয়েছে! তবু কেন যে পানুর দু'চোখ বেয়ে ঝর্ঝর্ করে জল নেমে এল তা সে জানে না।

দুই সাগরেদের গল্প

বঙ্কু ওস্তাদের দিনকাল ভাল যাচ্ছে না। শুধু বঙ্কু কেন, তামাম চোরছ্যাঁচোড়দেরই সময় খুব খারাপ।

ডাকাতদের কথা অবিশ্যি আলাদা। তারা সেই বেদ-পুরাণের যুগ থেকেই ভাল আছে। একই লাইনের লোক—শুধু উঁচু আর নিচু, অথচ চোরের নাম শুনলে মানুষ নাক সিঁটকোয়, আর ডাকাতের নাম শুনলে কপালে হাত ঠেকায়। উরে ব্বাস, ডাকাত! যেন ডাকাত কত ভক্তিভাজন!

এই নিয়ে বঙ্কু ওস্তাদের মনে ভারি দুঃখ। একটা ডাকাত ধরতে পারলে লোকে এমন ভাব করে, যেন বিরাট একটা কীর্তি করেছে। অথচ চোর ধরতে পারলে সামান্য পাঁচ-দশ ঘা লাগিয়ে, মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে, ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে গ্রামের সীমানা পার করে দিয়ে আসে।

এর ওপর যখন আদিখ্যেতা দেখিয়ে বলে,—সামান্য একটা সিঁদেল চোরকে মিছিমিছি মারছ কেন? তখন সত্যি সত্যিই অসহ্যই লাগে। এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কাঁহাতক সহ্য করা যায়!

বঙ্কু মাঝেমাঝেই ভাবে চুরি-টুরি ছেড়ে দিয়ে ভালমানুষ হয়ে যাবে। আর এ নিয়ে দু-চারবার প্রতিজ্ঞাও সে করেছে, তবু ছেড়ে দিতে পারেনি। অনেকদিনের অভ্যেস তো!

বঙ্কু একটা জিনিস কাউকে বোঝাতে পারে না। বঙ্কু বিশ্বাস করে, বোমা-পিস্তল নিয়ে দলবেঁধে কারো বাড়ি হানা দিয়ে সোনা-দানা লুট করে আনার চেয়ে একার চেষ্টায় মানুষের বাড়ি ঢুকে ধনসম্পদ সরানো অনেক সাহসের কাজ। এবং অনেক উঁচুদরের শিল্পকর্ম। এসব যোগ্যতা অর্জন রীতিমতো সাধনার ব্যাপার।

কিন্তু কাকে তুমি বোঝাবে একথা? কে বিশ্বাস করবে?

মুশকিল হয়েছে কি, লোকের হালচাল কেমন বদলে গেছে। লোকেরা আগে যেসব

জিনিস সামলে-সুমলে রাখত, এখন সেগুলো খোলামেলা পড়ে থাকে। আগেকার দিনে গৃহস্থের গোলা থেকে ধান-কলাই সরাতে পারলেও ওস্তাদি প্রমাণ হত। এখন তো ওসব খোলা উঠোনে পড়ে থাকে। ইচ্ছে করলেই তুলে আনা যায়। কিন্তু তাতে আনন্দ কোথায় ?

একরাতে বঙ্কু বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে এক গেরস্থ-বাড়ি থেকে এক বস্তা মুগকলাই সরিয়েছিল। তাই শুনে তার বন্ধুও-বটে শিষ্যও-বটে, শ্রীচরণ, তাকে যাচ্ছেতাই করেছিল। বলেছিল,—আরে ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নিচে নামতে পারলে! শেষকালে ধানচোর হলে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ, আবার কলাই চুরি!

বঙ্কু অবশ্য সাফাই গেয়ে বলেছিল,—হাত সুড়সুড় করছিল যে! কাজে বেরিয়েছি শূন্যি হাতে ফিরে আসব! কিছু সরাতে তো হবে! ধানকলাই চুরি যে আমাদের মানায় না, সে কি জানি না রে!

তবে তাতে শ্রীচরণের ছিঃ-ছিক্কার একটুও কমেনি।

কিন্তু না সরিয়েই বা কি করে বঙ্কু এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা! পেট চালাতে হবে তো! খাটুনি প্রচুর। মেহনত পোষাতে গেলে দামী জিনিস সরাতে হয়। কিন্তু সে তো অন্দরমহলে ঢোকার ব্যাপার। আর অন্দরমহল মানেই এক একটা দুর্গ। আজকাল গ্রামের লোকদের অবস্থা এত ফিরে গেছে যে মাটি দিয়েও যে বাড়ি তৈরি হয় তা যেন সবাই ভুলেই গেছে। বাড়ি মানেই পাকা বাড়ি। কিন্তু সিঁদকাঠির কেরামতিতে কি ইঁটের বাড়ি কায়দা করা যায় ? ভাঙাচোরা, লেস্তারা-খসা বাড়ি হলে অবিশ্যি আলাদা কথা। তা সে-রকম বাড়ি আর ক'টা ?

এই নিয়েই একদিন শ্রীচরণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল বঙ্কুর। বঙ্কু বলল,—খুবই সমিস্যের ব্যাপার ছিচরণ। এই আধবুড়ো বয়সে এসে আমাদের বোধহয় রুজি-রোজগারের অন্য ধান্ধা করতে হবে।

শ্রীচরণ বলল, — একথা বলছ কেন ওস্তাদ ?

— অনেক দুঃখে বলছি। সিঁদকাঠিটায় জং ধরে গেল। ছ'মাস ধরে তেল পড়েনি।

— মাঝে মাঝে দিলেই তো পার। যন্তর বলে কথা, মাজাঘষা না করলে অকেজো হয়ে যাবে।

— বাড়িতে তেল যখন আছে দিতে পারি বৈকি। কিন্তু দিয়ে কি কবব ? দালানবাড়িতে কি সিঁদ চলে ?

— তা বটে, সত্যিই সমিস্যে। সিঁদকাঠির যুগ বোধহয় ফুরিয়ে গেল।

বঙ্কু এবার রেগে গেল। ঝাঁঝাল গলায় বলল,—কোদাল, কুড়ুল, ছেনি-বাটালি-কাটারির যুগ ফুরলো না, শুধু সিঁদকাঠির যুগ ফুরিয়ে গেল!

ওস্তাদের রাগ দেখে শ্রীচরণ কেমন মিইয়ে গেল। বলল,—বলছি কি আর সাধে! এই বোমা পিস্তলের যুগে সিঁদেল চোরদের মনিষ্যি বলে জ্ঞান করে না কেউ। আমরা এখন কিরপার পাত্তর। এই তো মাসখানেক আগে এক রেতে ধরা পড়েছিলুম। অন্ধকারে দু'চার ঘা

দিয়ে বেঁধে রেখেছিল, সকালে তুলোধোনা করবে বলে। তা দিনের আলোয় আমাকে স্রেফ ছেড়ে দিলে। যে গেরস্তর বাড়ি হামলা করেছিলুম, সেই গেরস্ত কাউকে গায়ে হাত পর্যন্ত তুলতে দিলে না। গিন্নিমা সবাইকে বকাঝকা করে বললে,—করছিস কি! সারারাত বেচারা খেতে পায়নি! মুখখানা একেবারে শুকিয়ে আমসি! ....তুমি কিছু মনে কোরো না বাছা। মুড়ি-টুড়ি খেয়ে জিরিয়ে বাড়ি যাবে।

বঙ্কু এরকম কথা কখনও শোনেনি। চোখ কপালে তুলে বলল,—বলিস কি রে! এ-রকম হয় ?

— যা সত্যি, তাই বলছি গুরু। মাথার দিব্যি। তবে সব এলাকা তো সমান নয়। উত্তুরে লোকগুলোর দয়ামায়া আছে। তবে দখনেদের দেশে হলে বাটনা বাটা করে ফেলত।

বঙ্কু বলল,—ব্যাপারটা এট্টু খুলে বল দিকিন ছিচরণ।

শ্রীচরণ বলতে লাগল,—হয়েছিল কি, সেবার একটু এলাকার বাইরে চলে গিয়েছিলুম। ওদিকে এখনও বেশির ভাগ কাঁচা বাড়ি। তবে লোকের হাতে বিস্তর পয়সা। ওদেশে আমার এক দোস্ত আছে। তা সে বলেছিল,---তোমাদের অঞ্চলে কাজকম্মের সুবিধে না হলে এ-দিগরে চলে এসো। বন্ধুর কথা শুনে চলে গেলুম। এক রাত্তিরে বেরুলুম ডিউটিতে। কপাল খারাপ। ধরা পড়ে গেলুম। গিন্নিমা বাঁচাতে চাইলেও, আর ভালমানুষ কর্তা লোকটা আড়াল করতে চাইলেও. মানুষজন খেপে গিয়েছিল। তারা বললে,—আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। সিধে করে দিই।

গণপিটুনি যে কি জিনিস সে তো জানো ওস্তাদ। প্রাণটা যেতই। কিন্তু কত্তা-গিন্নি বোষ্টম মানুষ বলে বেঁচে গেলুম সে যাত্রা।

ওরা বললে,—চোর নয়, বাটপাড় নয়, ডাকাত নয়, সামান্য একটা সিঁদ দেওয়া চোর, চোর নামের অযুগ্যি বললেও হয়—তাকে মেরে ফেললে গাঁয়ের নাম খারাপ হবে। ওর চুল আর ভুরু কামিয়ে গাঁ থেকে বের করে দাও।

তাই হল। চুলের জন্যে জানটা বেঁচে গেল।

তা দক্ষিণ দেশের ব্যাপারটা এইরকম। এমন ঘেন্না হয় যে ছুঁয়েও দেখবে না গ্রামের নাম ডুবে যাবার ভয়ে। নচেৎ পিটিয়ে লাশ করে ফেলবে। হয় এটা, না হয় ওটা।

এই বলে শ্রীচরণ হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল,—তাহলেই বলো আমাদের পেশার ওপর ঘেন্না ধরে যায় কি না! আমরা ছোঁবারও অযোগ্য। এত অপমান সহ্য হয় ?

তাই বলছিলুম ওস্তাদ, সিঁদকাঠির যুগ বোধহয় ফুরিয়ে গেছে!

বঙ্কু একহাতের তালুতে অন্যহাতের সজোর ঘুঁষি মেরে বলল,—তুই কালকা যুগী, তোর [illegible] আলাদা। কিন্তু আমার এ তিন পুরুষের পেশা। ঠাকুর্দা ছিল সিঁদকাঠিব নামকরা কারিগর। বাবাও লাইনেরই লোক। ঠাকুর্দার [illegible] অতটা না হলেও বাবাও কম যেত না। বাবার কাছেই আমার [illegible]ড়ি। আমার পাতলা শরীর দেখে বাপ বলত,—তোর কুচকুচে কালো রঙ, আর

বাঁশপাতার মতো হাল্কা শক্ত শরীর। ভগবান তোকে সিঁদেল চোর হবার জন্যই গড়েছে।

মরার সময় পাশে ডেকে বললে,—বঙ্কু, তোর জন্য কিছু রেখে যেতে পারলুম না। তবে সিঁদকাঠিটা রইল। এটার মানমর্য্যাদা রাখিস। তা ছিচরণ, তুই এ-জিনিসের দাম বুঝবি কি! আমি যদি না বুঝি বাপটা স্বগ্‌গে গিয়েও কষ্ট পাবে।

বঙ্কুর কথা শুনে শ্রীচরণ এবার ফিক্‌ করে হেসে ফেললে, —চোর ছ্যাঁচোড়রা স্বগ্‌গে যায় শুনিনি কখনও। তুমি গুরু হাসালে মাইরি।

বঙ্কু চোখ গরম করে বলল,—তবে কোথায় যায় ?

— নরকে।

— মুখ সামলে কথা বলবি ছিচরণ। আমি রাগলে একেবারে দুব্বাসা মুনি। হ্যাঁ। সম্‌সারে আমাদের চেয়ে খারাপ লোক কম আছে ? আমার বাপ তো তাদের হিসেবে মহাপুরুষ। তাহলে স্বগ্‌গে যাবে না কেন? আর কেনই বা আমরা চুরি করি বলতো ?

—কেন ?

—পেটের দায়ে। এই দেখ না, বাড়িতে কিছু খাবার নেই, তাই বকে বকে খিদে ভোলার চেষ্টা করছি। তুই বন্ধু লোক, বাড়িতে কিছু থাকলে শুকনো মুখে তোকে বসিয়ে রাখি ? ......তোকে বলছিলুম না সিঁদকাঠিতে কতদিন তেল দিইনি! আসল কথাটা হল তেল কেনার পয়সাই নেই। তোর অবস্থাই কি আমার চেয়ে ভাল ? কিচ্ছু বুঝি না মনে করিস? ......মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানিস ? চুরি নয়, এবার থেকে ডাকাতি করব।

শ্রীচরণ সাগ্রহে বলে উঠল,—আমিও তাই ভাবছিলুম ওস্তাদ, সাহস করে বলতে পারি নি। ওই কাঠিটার ওপর তোমার যা ভক্তি—বলার সাহস হয়নি। শোন ওস্তাদ, আমরা ডাকাত দলেই ভেড়ার চেষ্টা করি। কি, রাজি আছ ?

রাজি। — বঙ্কু ঘাড় নাড়ল। কি যেন একটু ভেবে বলল—তবে একদলে থাকব না। আলাদা আলাদা।

— সেই ভাল।

মাস তিনেক পরে আবার ওদের দেখা হতে বঙ্কু বলল,—কেমন চলছে রে ?

শ্রীচরণকে ভারি কাহিল দেখাচ্ছিল। হতাশ গলায় বলল,—ঘোরাঘুরিই সার। পাত্তাই দিল না ডাকাতরা। বললে,—ছিঁচকে চোর হয়ে আস্পদ্ধা তো কম নয়, আমাদের সঙ্গে ভিড়তে চাস! ......বুঝলে গুরু, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। ......তা তোমার কদ্দূর কি হল বল ?

বঙ্কুকেও ভারি বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—আমার খবরও একই রকম। পরিচয় দিতে নাক-টাক সিঁটকে বললে—এখানে নয়, অন্য রাস্তা দেখ। ডাকাতরা হল নৈকষ্যি কুলীন। তোমরা সেখানে অচল।

এক একদিন কি মনে হয় জানিস, আত্মঘাতী হয়ে জ্বালা জুড়োই। একদিকে পেটের জ্বালা, অন্যদিকে মানমর্য্যাদা নিয়ে টানাটানি—কাঁহাতক আর বাঁচতে ভাল লাগে! একদিন শুনবি বঙ্কু

ওস্তাদ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

শ্রীচরণ কি যেন ভাবছিল নিজের মনে। ভেবে-টেবে শেষকালে বলল,—ওসব কিছু করতে হবে না তোমাকে। আত্মহত্যে ভাল কাজ নয়। বরং একটা জিনিস করি এস। আমরা দুজনে তো একসঙ্গে কাজ করিনি, এবার একজোট হয়ে নামি। তোমার বুদ্ধি, আমার মেহনত। রাজযোটক নয়? একসঙ্গে নামলে না খেয়ে মরতে হবে না।

বঙ্কু বলল,—আমি রাজি। ভাল ফন্দি বাতলেছিস।

ফন্দি ভাল। নিজের পেশাতেও ওরা সুদক্ষ সন্দেহ নেই। কিন্তু কপালের লিখন খন্ডাবার ক্ষমতা ওদের ছিল না।

পাঁচ-সাতবার নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সারার পর একদিন ওরা ধরা পড়ে গেল।

ভুল অবিশ্যি ওরা করেছিল, সে কথা ওরা একশো বার মানবে।

তা ভুল হচ্ছে তিনটে। চাঁদনি রাত, খালি পেট, আর প্রথমেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়া।

সেদিন ওরা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিল মাইল চার দূরের এক গ্রামে। মাঠের ধারে, গ্রমের কিনারা ঘেঁষে বাড়িটি। মাঠকোঠা, টিনের ছাউনি, উঠোন ঘিরে মরাই, গোয়াল, রান্নাঘর। বাড়িটা কিছুটা গোলকধাঁধার মতো। সুবিধের মধ্যে চারপাশে কোন পাঁচিল-টাচিল নেই। দেখে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি বলেই মনে হয়।

চারধার বেশ ভাল করে ঠাহর করে বঙ্কু বলল,—এখানে বেশ ভালরকম মালকড়ি পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে, না রে ছিচরণ?

'ছিচরণ' তো একপায়ে খাড়া। বলল,—হ্যাঁ ওস্তাদ।

—তা হলে কাজ শুরু করে দে।

ভুলই বলতে হবে। ভাগ্যটা খারাপ, তাও সত্যি। নাহলে এত জায়গা থাকতে প্রথমেই ওরা রান্নাঘরে ঢুকতে যাবে কেন?

ঢুকেই শ্রীচরণ বলল,—ভালমন্দ রান্নার গন্ধ পাচ্ছি। বেজায় খিদে পেয়ে যাচ্ছে। এরা খায়-দায় ভাল, বুঝলে গুরু?

—আমারও খুব খিদে পাচ্ছে রে! খুঁজে দেখ তো খাবার-দাবার মেলে কিনা।

তা মিলল। টর্চ জ্বেলে দেখতেই চোখে পড়ল চাপাচুপি দেওয়া খাবার। দু'জামবাটি ভাত থালা চাপা দেওয়া, জলে ভিজোনো। তরি-তরকারিও ছিল।

এরপর আর বলা-কওয়া নেই, শ্রীচরণ ঝাঁপিয়ে পড়ল ভাত-তরকারির ওপর। দেখাদেখি বঙ্কু ওস্তাদও বসে পড়েছে।

দুজনে প্রায় পাঁচজনের খাবার নিঃশেষ করে দিল লহমায়।

দম ফেলবার ফুরসত মিলতে পর পর ক'টা ঢেকুর তুলে বঙ্কু বলল,—অনেকদিন পর বড্ড ভাল খেলাম রে। চল, এবার বাইরে যাই। মাথাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে ভাবা যাবে কি করা যায়।

বাইরে এসে শ্রীচরণ বলল,—এমন চাঁদনি রাত, ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে। এমন রাতে

লোকে আনন্দ করে ঘুমোয়। আর আমাদের দেখ, এমন মন্দ কপাল ভূতের মতো রাত জেগে কোন্ শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

বঙ্কু বলল,—আমার কিন্তু খুব ঘুম পাচ্ছে। চোখ জুড়িয়ে আসছে।

শ্রীচরণ পর পর ক'টা হাই তুলে বলল,—আমারও। আর জেগে থাকতে পারছি না।

বঙ্কু বলল,—তাহলে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু সতর্ক থাকিস ভাই। অসুবিধে বুঝলে ডেকে দিবি।

শ্রীচরণ বলল,—তোমাকেও বলে দিচ্ছি সতর্ক থাকবে। ঝামেলা বুঝলে ডেকে দেবে।

কিন্তু ওদের বোধহয় কালনিদ্রা পেয়ে বসেছিল। তাছাড়া কোনরকম ঝামেলাও হয়নি। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট ঘুম। সেটা একসময় ভাঙল ঠিকই, কিন্তু তখন আর রাত নেই। দিনের আলো ফট্‌ফট্ করছে চারধারে।

ঘুম ভাঙতে ওরা দেখল বার-উঠোনে ধুলোর ওপর শুয়ে আছে। আর একদল লোক, মারমুখী জনতা বললেই ঠিক বলা হবে, ওদের ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

একজন্ মাঝবয়েসী গোলগাল চেহারার মানুষ ওদের খর নজরে দেখছেন। তবে তাঁর চোখে জিঘাংসার ছাপ নেই। বরং বেশ কোমলতা ঝরে পড়ছে তাঁর দৃষ্টিতে।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল,—বিরিঞ্চিবাবু, আপনি একজন মাননীয় পঞ্চায়েত সদস্য। আপনার বাড়িতে হামলা! আমাদের হাতে তুলে দিয়ে এবার আপনি সরে যান। বাকি কর্তব্য আমরাই পালন করছি।

মাঝবয়েসী মোটাসোটা লোকটিই বিরিঞ্চিবাবু। বিরিঞ্চি হালদার। হালদার মশাই বললেন,— দু'দুটো নরহত্যার চার্জে তোমরা আমাকে ফেলো না। তোমরা কি কর্তব্য করবে তা আমি জানি। শোন ভাইসব, এ লোক দুটো স্বভাবচোর নয়, অভাবচোর। পেটের দায়ে বেরিয়েছে। না হলে চোর এসে পান্তাভাত খেতে বসে যায়, কেউ কখনও শুনেছ? একেবারে চেটেপুঁছে খেয়েছে।

বঙ্কু আর শ্রীচরণ এতক্ষণ হাঁ করে কথাবার্তা শুনছিল। বিশেষ করে বিরিঞ্চি হালদারের কথা। দুজনেই ঘাড় নেড়ে সমস্বরে বলে উঠল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ একেবারে লেহ্য কথা।

বঙ্কু এবার শ্রীচরণকে থামিয়ে দিয়ে বলতে লাগল,—আর একটা কথা, আজ্ঞে। এ আমার বাপ-পিতেমোর ব্যবসা। আমার বাপঠাকুর এ বিদ্যে ছাড়া অন্য বিদ্যে দিয়ে যায়নি। সেজন্যেও এ রাস্তায় নামতে হয়েছে। সবই খোলসা করে কইলুম। এখন আপনি যা বিবেচনা করেন।

তোমাদের নামই তো এখনও জানা হল না হে।—বিরিঞ্চিবাবু বললেন।

বঙ্কু বলল,—আমার নাম বঙ্কুবিহারী মণ্ডল।

শ্রীচরণ বলল,—আমি হলুম ছিচরণ সামন্ত।

বিরিঞ্চিবাবু ভিড়ের উদ্দেশে বললেন,—অপরাধীদের সব কথাই তোমরা শুনলে। ওরা লোক মন্দ নয় দেখা যাচ্ছে। সত্য গোপন করেনি। তবে ওরা ভুল কাজও করেছে। আমি সিঁদেল চোর হলে জ্যোৎস্নারাতে কখনও বেরোতাম না। তাছাড়া খালি পেটে চুরি করতে

বেরনোও চৌরশাস্ত্র-বিরোধী। যাই হোক ওদের ভাগ্য ভাল যে আমার বাড়িতে ঢুকেছিল। অন্য জায়গা হলে এতক্ষণ লাশ হয়ে যেত। আমি মাননীয় পঞ্চায়েত সদস্য শ্রী বিরিঞ্চি হালদার, তা হতে দিতে পারি না। বরং ওদের বাঁচার একটা চান্স দিতে চাই। ওহে বঙ্কু-শ্রীচরণ, তোমাদের গায়ে গতরে খেটে খেতে আপত্তি আছে?

আজ্ঞে না।—বঙ্কু বলে উঠল।

শ্রীচরণ তার সঙ্গে সুর মেলাল।

—তাহলে যা বলছি শোন। আমার বাড়িতে কাজ প্রচুর। জমিজিরেত আছে। গঞ্জে গোলদারি দোকান আছে। তোমরা ফাইফরমাস খাটবে। বঙ্কু তোমার হাল্কা-পলকা চেহারা, তুমি করবে বাড়ির কাজ। শ্রীচরণ, তুমি মোটাসোটা শক্ত পোক্ত, তুমি করবে দোকানের কাজ। তবে হ্যাঁ, শর্ত আছে। বঙ্কু, তুমি কখনও গঞ্জে যেতে পারবে না। আর শ্রীচরণ ভুল করেও তুমি কখনও এ বাড়ির ছায়া মাড়াবে না। মোদ্দা কথা তোমাদের মধ্যে আর দেখা হচ্ছে না। হলে তোমরা নতুন মতলব আঁটার সুযোগ পেয়ে যাবে। রাজি তো?

বঙ্কু হাত জোড় করে বলল,—আপনি আমাদের কিতাথ করে দিলেন।

শ্রীচরণ বলল,— আপনার ছিচরণে চিরকিতজ্ঞ রইলুম।

চোরের এই অতিভক্তি দেখে জনতা হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। বিরিঞ্চি হালদারের ব্যবহার তাদের ভাল লাগেনি। মারমুখী মানুষগুলো 'বিচারটা আপনার ঠিক হল না হালদার মশাই' বলতে বলতে চলে গেল।

দুই সাগরেদ সেইদিন থেকেই বিরিঞ্চিবাবুর অধীনে কাজে বহাল হয়ে গেল। বঙ্কু বাড়িতে, আর শ্রীচরণ গঞ্জে। দুঃখ একটাই যে পরস্পরের কাছ থেকে ওরা শেষ বিদায়টুকুও নিতে পারল না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ওরা বুঝতে পারল হালদারমশাই লোক মন্দ নয়। দয়ামায়া আছে। ওদের নেহাত চাকর-বাকর বলে মনে করেন না। খাওয়া-দাওয়া ভাল তো বটেই, এমনকি শরীর খারাপ হলে ছুটি পর্যন্ত মিলে যায়। ওষুধ-পত্তর জোটে। পৃথিবীতে এত ভাল লোক আছে, হালদারমশাইকে না দেখলে ওরা বোধহয় বিশ্বাসই করত না।

মানুষের চরিত্রে স্পর্শমণির গুণ থাকে বোধহয়। তার ছোঁয়ায় লোহাও বুঝি সোনা হয়ে যায়। তাই হয়তো বঙ্কু-শ্রীচরণও বদলে যেতে লাগল। যারা রব তুলেছিল যে বিরিঞ্চিবাবু চোরকে প্রশ্রয় দিয়ে গর্হিত কাজ করেছেন, তারাও ক্রমে ক্রমে স্বীকার করল যে লোকগুলো খারাপ নয়, বরং বেশ ভাল। বলতে কি, বেশ সুনাম হয়ে গেল বঙ্কু-শ্রীচরণের। পরোপকারী হিসেবেও নাম ছড়িয়ে গেল। একটাই দুঃখ ওদের। শ্রীচরণের জন্য বঙ্কুর, আর বঙ্কুর জন্য শ্রীচরণের মনটা বড় আকুলি-বিকুলি করে। কিন্তু দেখা হবার উপায় নেই। বিরিঞ্চিবাবু আর সবদিক থেকে নরম হলেও ওদের ওপর নজরদারির ব্যাপারে বেশ কড়া।

তবে কিনা লখিন্দরের লোহার বাসরঘরেও কালনাগিনী ঢুকেছিল—শাস্ত্রে লেখা আছে। এখানেও কড়া নজরদারির মধ্যেও ছিদ্র ছিল। সব বাড়িরই এমন কিছু কিছু কাজ থাকে, যাতে

কাজের লোককে বাইরে ছুটতে হয়। বঙ্কুকেও ছুটতে হত।

সেদিন হালদারমশাইয়ের বাড়িতে শহর থেকে অতিথি আসবে। সন্ধেবেলায় ভোজের আয়োজন। বঙ্কুর ওপর ভার পড়েছে তিন মাইল দূরের স্টেশনের বাজার থেকে ভাল মাছ, মিষ্টি আর মশলাপাতি আনার।

অর্ধেক রাস্তা যাবার পর সে দেখল উল্টোদিক থেকে শ্রীচরণ আসছে। প্রায় দু'বছর পর ওদের দেখা।

—ওস্তাদ তুমি! আছ কিরকম ?

—ভাল। তুই ?

—খুব ভাল। উঃ, কতদিন পরে দেখা হল! আমি যাচ্ছি দোকানের মাল গস্ত করতে। তুমি?

ইস্টিশান পাড়ায়। বাজার করতে। চল, ওই গাছের ছায়ায় বসে দুটো গল্প করি। অনেক কথা জমে আছে।

রাস্তা থেকে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে একটা গাছ। সেখানে গিয়ে ছায়ায় বসার পর শ্রীচরণ বলল,— তোমার ফুঁয়ে ওড়া শরীরে তো বেশ গত্তি লেগেছে দেখছি। আরামেই আছ তাহলে?

বঙ্কু বলল,—তুইও তো বেশ মুটিয়েছিস। খারাপ নেই মনে হচ্ছে। মাল গস্ত করতে যাচ্ছিস বললি। তার মানে কাঁচা পয়সার ব্যাপার। কিছু সরাস-টরাস না তো!

শ্রীচরণ জিভ কেটে বলল,— ছিঃ, কি যে বল! এক পয়সাও সরাইনি কখনও। তুমি তো বাজার-টাজার কর। তাতেও তো কাঁচা পয়সার ব্যাপার।

—বিশ্বাস কর ছিচরণ, একটা পয়সাও কখনও ইদিক উদিক করিনি। হালদারমশাই দেবতা লোক। ওনার পয়সা নিলে পাপ হবে না। নেবার ইচ্ছে হয়নি কোনদিন।

—আমারও সেই অবস্থা।

শ্রীচরণ কি যেন ভাবছিল। ওর চোখেমুখে কেমন চিন্তার ছাপ। বলল,—একটা কথা শুধোই ওস্তাদ। আগে খারাপ কাজ করলেও, আমরা এখন ভাল লোক হয়ে গেছি—তাই তো! আমাদের স্বগ্‌গে না নরকে, কোথায় ঠাঁই হবে ?

শ্রীচরণের এই তাত্ত্বিক-দার্শনিক-প্রশ্নে বঙ্কু প্রথমটায় কেমন ভড়কে গেল। তারপর চিন্তিত গলায় বলল,—শক্ত প্রশ্ন। তবে আমরা তো এখন স্বগ্‌গেই আছি রে। হালদারমশাই বলেন স্বগ্‌গ-নরক এই পিথিবিতেই। বিরিঞ্চি কথার মানে জানিস ? ব্রহ্মা। তা ব্রহ্মার কাছে যারা থাকে তারা স্বগ্‌গবাসী নয় ? ......হাতে আর সময় নেই। দুটো কথা বলে নিই। শোন, দেখা হলে আমাকে আর কখনও ওস্তাদ বলে ডাকবি না। দু'নম্বর কথা হল—স্বগ্‌গে যখন আছিস, সেখানেই থাকার চেষ্টা করবি। আমিও সে চেষ্টাই করব। মনে থাকবে তো ?

শ্রীচরণ বলল,—থাকবে।

দেশপ্রেমিক জলদস্যু

উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। আজকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেদিনকার আমেরিকার কোথাও তেমন মিল ছিল না। সবেমাত্র অনেকগুলি রাজ্য আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তারা অনেকটাই স্বাধীন। মার্কিনী আধিপত্য তেমন শেকড় গেড়ে বসতে পারেনি সে সব রাজ্যে। এমনই একটি প্রদেশ হলো লুইজিয়ানা। মাত্র দশ বছর আগে এটি আমেরিকার দখলে আসে। এখানকার লোকেরা তখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বদেশ ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বাসিন্দারা বেশির ভাগই ফরাসী আর স্প্যানিশদের বংশধর যারা সাধারণ ভাবে ক্রিয়োল নামে অভিহিত। এদের না ছিল ফ্রান্স বা স্পেনের প্রতি আনুগত্য, না নিজেদের আমেরিকাবাসী বলে ভাববার অভ্যাস। স্বতন্ত্র একটা জাত বললেই ঠিক হবে।

এহেন লুইজিয়ানা প্রদেশের গভর্নর হয়ে এলেন উইলিয়ম ক্লেবোর্ন নামে একজন আমেরিকান। লুইজিয়ানায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আমেরিকার প্রতি এখানকার অধিবাসীদের বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলার গুরু দায়িত্ব নিয়েই এলেন তিনি।

কিন্তু এসে অবিলম্বে বুঝতে পারলেন সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজটি তাঁকে করতে হবে তা হল জলদস্যু জাঁলাফিৎকে শায়েস্তা করা। জাঁলাফিৎ এক অভিজাত বংশের সন্তান, এক ফরাসী সামন্তের পুত্র। তাঁর চেহারা ও আচার-আচরণে জন্ম-অভিজাত্যের লক্ষণ এমনই পরিস্ফুট যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, সুশ্রী চেহারা, নরম আর বিনয়পূর্ণ কথাবার্তায় সকলকে সে মুহূর্তে বশ করে। নিউ অর্লিন্স তখন লুইজিয়ানার উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর। সেখানকার অভিজাত সমাজে জাঁলাফিতের কদরের শেষ নেই।

নিউ আর্লিন্সের রয়াল স্ট্রিটের জমকালো বিপণিগুলোয় যে সব বহুমূল্য রেশম -ভেলভেট রুপোর পাত্র, মণিরত্ন আর দুর্লভ সুপেয় ব্র্যাণ্ডি পাওয়া যায় সে গুলোর সরবরাহকারী যে খোদ জাঁলাফিৎ সেকথা শহরের শিশুরা পর্যন্ত জানত। তবে শহরবাসীরা সব জেনেও চোখ বুজে থাকত। হুল্লোড়প্রিয় মানুষগুলো বিলাস - ব্যসনের উপকরণ পেয়েই খুশি। তার যোগান কিভাবে ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তারা বোধ করত না। প্রশাসনকে জানানোর কর্তব্যপালন তো অনেক দূরের কথা। উল্টে তারা যেন লাফিতের কাছে খানিক কৃতজ্ঞ। ফলে জাঁলাফিৎ নিউ আর্লিন্সে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত এই সাগর সন্ত্রাস দস্যুরা ডাঙায় নিষ্কণ্টক নয় .শত্রু পক্ষ থাকেই। মজার কথা, জাঁলাফিৎ তার ঘাঁটি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে বিশেষ করে নিউঅর্লিন্সে প্রায় সকলের সম্মানের পাত্র।

গভর্নার ক্রেবোর্ন এসব যতো দেখেন শোনেন ততই তাঁর রাগের মাত্রা চড়তে থাকে। চরিত্রে মানুষটা খাঁটি ঔপনিবেশিক, দেহের প্রতিটি ইঙ্গিতে শাসকের দম্ভ। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা তখনকার আমেরিকায় কোনো নিরীহ লোককে দিয়ে গভর্নরের কাজ চলত না। যা হোক, জাঁফালিৎকে ধরবার প্রথম চেষ্টা হিসাবে ক্রেবোর্ন একটি নিরীহ পদ্ধতিই গ্রহণ করলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর নিউঅর্লিন্সের রাস্তায় রাস্তায় একটি বিজ্ঞপ্তি সাঁটা দেখা গেলো। তাতে ঘোষণা করা হয়েছে জাঁলাফিৎকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে ৫০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে সরকারের তরফ থেকে। বিজ্ঞপ্তির নিচে স্বয়ং গভর্নরের স্বাক্ষর।

মানুষ মাত্রেরই মিত্র এবং শত্রু থাকে। ক্রেবোর্ন ভেবেছিলেন মোটা অঙ্কের পুরস্কারের লোভে কেউ না কেউ টোপ গিলবে। পাঁচশো ডলার কিন্তু কোনো ফসলই ফলাল না। বরং বিজ্ঞপ্তির প্রচারের তিনদিন পরে এমন বিচিত্র একটি ঘটনা ঘটল তা গভর্নরের সম্মানের প্রতি একটা মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। গভর্নর নিজের চোখেই দেখলেন তাঁর দেওয়া বিজ্ঞপ্তির ওপর একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি সাঁটা হয়েছে যাতে লেখা, "গভর্নর উইলিয়াম ক্রেবোর্ণকে যে ব্যক্তি জাঁলাতিফের কর্মকেন্দ্র গ্র্যান্ড আইলে সমর্পণ করতে পারবে তাকে ১৫০০ ডলার উৎকোচ দেওয়া হবে।"

কান্ডটা যে জাঁলাফিতেরই তাতে সন্দেহ রইল না গভর্নরের। জলদস্যুর ঘৃণ্য দুঃসাহস ও ধৃষ্টতায় ক্রেবোর্ন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কল্পনানেত্রে দেখতে পেলেন এই বিজ্ঞপ্তি পড়ে নিউ অর্লিন্সবাসীদের ঠোঁটগুলোয় কৌতুকের হাসি উপচে পড়ছে। স্বাভাবিক। তারা তো এরকমটাই চায়।

বিজ্ঞপ্তির মধ্যে যে গ্র্যান্ড আইলের কথা ছিল তা জাঁলাফিতের মূল ঘাঁটি। বারাটরিয়া উপসাগরের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ওই গ্র্যান্ড আইল্স। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত স্থানটি জলদস্যুদের আস্তানা হিসাবে একেবারে আদর্শ। সামনেই অসীম সমুদ্রের বিস্তার যা আন্তর্জাতিক

জলপথ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনীয়, ব্রিটিশ আর আমেরিকান পণ্যবাহী জাহাজগুলোর নিয়মিত এখান দিয়ে আনাগোনা। লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে লাফিতেরও কোন বাছ-বিচার নেই, মার্কিন জাহাজকেও ছেড়ে কথা কয় না। গভীর দরিয়া থেকে অজস্র খাঁড়ি আর লেগুনের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট নৌকাযোগে লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্র্যান্ড আইলে আনাই তার পদ্ধতি। পদ্ধতিটায় চাতুর্য নেই, তার দরকারও নেই। সারা পথটাই খাঁড়ি আর হ্রদের এমন গোলকধাঁধা যে তার রহস্য উদ্ধার কেবল তুখোড় জলদস্যুরাই করতে পারে। গোটা গ্র্যান্ড আইল ঢেকে আছে বেত লতাপাতা এবং সাইপ্রেস গাছের দুর্ভেদ্য ঝোপে। এর মধ্যে লুঠের জিনিস গোপন রাখাও সহজ কাজ। তারপর সেসব সামগ্রী চড়া দামে কালোবাজারি করার স্বর্গরাজ্য নিউ অর্লিন্সে পাঠিয়ে দিতে কতক্ষণ!

জাঁ লাফিৎ পণ্যদ্রব্য হিসেবে আফ্রিকার কালো মানুষদেরও রেহাই দিত না। মার্কিন সরকার তখন আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। ফলে বাগিচা অঞ্চলে শ্রমিক ঘাটতির সমস্যা প্রবল। লাফিৎ এ সুযোগ ছাড়ে কেন? স্পেনের বাণিজ্য তরীগুলোয় নিগ্রো দাসেরা কাজ করত। এরকম একটা জাহাজ কব্জা করতে পারলে মোটা মুনাফা। কালো একটি শরীরের দাম ছিল পাউন্ড প্রতি এক ডলার। সুতরাং একটা দশাসই নিগ্রোর দাম দেড়শো থেকে দুশো ডলার। এই অভিনব পশরার চাহিদা তখন আমেরিকায় প্রচুর।

বিশেষ করে এই মানুষপণ্যের ব্যবসার জন্য জাঁ লাফিতের ওপর সৎ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গভর্নর ক্লেবোর্নের ঘৃণার অন্ত ছিল না। কিন্তু প্রশাসন তো শুধু একাকী গভর্নরকে দিয়ে গড়া নয়। তাঁর কর্মচারীদের মনস্তত্ত্ব যে আলাদা। হয়তো একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে সদলবলে পাঠানো হল জাঁ লাফিৎকে ধরতে। অফিসার লাফিতের বিলাসবহুল আপ্যায়ন আর বিপুল উপঢৌকনে তৃপ্ত হয়ে শূন্যহাতে ফিরে এলেন, আর এসে বললেন, 'জলদস্যু কোথায়, লাফিৎ তো পারফেক্ট জেন্টলম্যান। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। ওর গায়ে হাত তোলার কথা ভাবাই যায় না গভর্নর!'

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং ভাল ভাল খানাপিনা খেয়ে আর খাইয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল লাফিতের। ক্লেবোর্নের মত দক্ষ প্রশাসকও ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছিলেন না। এমন সময় বিশেষ একটি ঘটনা ওর গতানুগতিক জীবনে কিছুটা পালাবদল ঘটাল।

আমেরিকার সঙ্গে ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। সালটা ১৮১২, যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ। ইংরেজদের জয়ের সম্ভাবনা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। এই সময় একদিন ব্রিটিশ সম্রাটের যুদ্ধ জাহাজ 'সোফিয়া' নীল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত গ্রান্ড আইলের তটরেখায়। নোঙর করল জাঁ লাফিতের ঘাঁটিতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন লাফিৎকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'লাফিৎ, তুমি একজন পাইরেট, তোমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাই। আমরা নিউ অর্লিন্স বন্দর থেকে মার্কিন আধিপত্য উচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক। আমাদের সম্রাটের পক্ষে তুমি

যদি যোগ দাও তবে উচ্চ রাজকীয় সম্মান আর সামরিক পদ পাবে। অন্যথায় তোমার এই ঘাঁটি কামান দেগে উড়িয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। কোনটা চাও বল।'

ল্যাফিৎ মৃদু হেসে নরম গলায় বলল, 'অধমের ওপর মহামান্য ইংলন্ডেশ্বরের অসীম দয়া। কিন্তু একটু ভেবে দেখতে সময় দিতে হবে। দলের লোকজনদের সঙ্গেও আলোচনা করা দরকার।'

ক্যাপ্টেন উদারভাবে হাসলেন, 'সে ঠিক কথা। তবে বেশি সময় তো দেওয়া যাবে না।' ল্যাফিৎও সৌজন্যসূচক হাসি হাসল, 'বেশি সময় নেবোও না আমি।' ওর হাসিটা যে ক্রমশঃ বাঁকা হাসিতে পরিণত হল সেটা বোধহয় লক্ষ্যও করলেন না আত্মতুষ্ট ইংরেজ ক্যাপ্টেন।

ল্যাফিৎ নিলও না বেশি সময়। ওর একটি গোপন পত্র নিয়ে একখানা দুরন্তগতি নৌকা কখন যে গভর্নর ক্লেবোর্নের কুঠিতে বিশেষ সংবাদ পৌঁছে দিতে ধেয়ে গেল 'সোফিয়ার'-র ক্যাপ্টেন তা টেরও পেলেন না। ক্যাপ্টেন মহোদয় যখন পা দোলাতে দোলাতে হাভানা চুরুটে সুখটান দিচ্ছেন ততক্ষণে গভর্নর ক্লেবোর্ন ল্যাফিতের দূতের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি পড়ে জানতে পেরে গিয়েছেন ইংরেজদের আক্রমণ পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি। চিঠিতে এটাও পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে আমেরিকা আর ইংলন্ডের বিবাদে ল্যাফিৎ আমেরিকার পক্ষেই অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত।

ল্যাফিতের এই অপ্রত্যাশিত উদারতায় গর্ভনর ক্লেবোর্নের মুগ্ধ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ক্লেবোর্ন মানুষটার চরিত্রের কাঠামো অন্য ধরণের। ল্যাফিতের পত্রের যে উত্তর গভর্নরের কাছ থেকে প্রেরিত হল তা হল আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত একটি নৌবহর। আইন অমান্যকারীর সাহায্য নিতে আদৌ প্রস্তুত নন তিনি। ক্লেবোর্নের নৌসেনা ল্যাফিতের ঘাঁটি তছনছ করে দিল আগুন এবং বুলেটে।

মেজর জেনারেল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন তখন নিউ অর্লিন্সের প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত। সব ঘটনা শুনে তিনি গভর্নরকে বললেন, 'আইন ভঙ্গকারীদের সঙ্গে কোনো রফা নয়। ল্যাফিতের সঙ্গে সঙ্গত ব্যবহারই করেছেন আপনি।'

তা বলুন, এদিকে তখন অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের সময়ও ভালো যাচ্ছে না। নিউঅর্লিন্সের প্রতিরক্ষার সুবন্দোবস্ত তেমন করে উঠতে পারেনি তিনি। প্রয়োজনীয় সমরোপকরণের অভাব, অভাব গোলন্দাজ সৈন্যের। সুগঠিত ইংরেজ নৌবহরের তুলনায় আমেরিকার নৌসেনা বড়ই দুর্বল। নিউঅর্লিন্সের পতন অনিবার্য। এদিকে খবর এসেছে দুর্ধর্ষ নৌ -সেনাপতি স্যার এর্ডওয়ার্ড পাকেনহাম সুশিক্ষিত চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে লুইজিয়ানা দখল করতে বেরিয়ে পড়েছেন।

শিবিরে বসে জেনারেল জ্যাকসন ক্রোধে ক্ষোভে অসহায়তার যন্ত্রণায় মাটির পাইপ কামড়ে গুঁড়ো করার উপক্রম করছেন অথচ ইংরেজদের মোকাবেলা করার কোনো উপায় বের

করতে পারছেন না, এমনি সময়ে একদিন প্রহরী খবর নিয়ে এলো এই মুহূর্তেই একজন আগন্তুক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, খুবই নাকি জরুরি দরকার।

'দরকারটা কার? তার না আমার?' জেনারেলের ভ্রুকুঞ্চিত, স্পষ্টতই বিরক্ত তিনি। প্রহরী সবিনয়ে জবাব দিল, 'লোকটা বলছে দরকার আপনার।'

'বলে দাও দেখা হবে না।' নিজের দুশ্চিন্তায় পাগল জেনারেল এই বলে ব্যাপারটার ওখানেই নিষ্পত্তি ঘটাবার তালে আছেন এমন সময় সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তি শিবিরে ঢুকে পড়ল সামরিক আইনের তোয়াক্কা না করে। ছ' ফুটের উপর লম্বা ঋজু ইস্পাত - কঠোর শরীর, রোদপোড়া রঙ সত্ত্বেও সুন্দর আভিজাত্য মণ্ডিত মুখ। পরণে জলপাই রঙের পোষাক। মাথায় চামড়ার তৈরি কপাল ঢাকা টুপি। সব মিলিয়ে আগন্তুক বেশ আকর্ষণীয়। লোকটির ভাবভঙ্গি যে কোনো ব্যারণ বা কাউন্টের মত। মার্জিত অথচ উদ্ধত। একজন জেনারেলও তার চোখে যেন সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

নবাগতের ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে জ্যাকসন শুধোলেন, 'তুমি জানো এভাবে বে-আইনী ঢুকে পড়ার জন্য তোমাকে শাস্তি দেওয়া চলে?'

আগন্তুক মৃদু হেসে বলল, 'চলে। আর সেটা জানি না তাও নয়। তবে জরুরি অবস্থায় এতসব নিয়ম মানতে গেলে চলে না, কাজের ক্ষতি হয়। আপনি আমায় তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন, নয় কি?'

উদ্যত ক্রোধ দমন করে জ্যাকসন বললেন,'কাজটা কি তা বলো। তার আগে তোমার পরিচয় কি?'

আগন্তুকের মুখে একটা রহস্যময় কৌতুক হাসি ফুটে উঠল, 'আমাকে আপনার চেনা উচিত ছিল, মিঃ জ্যাকসন। গভর্নর ক্লেবোর্ন আমারই মাথার দাম ঘোষণা করেছিলেন পাঁচশো ডলার।'

অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মুখে যুগপৎ মেঘ আর রোদের খেলা খেলে গেল, 'জাঁ লাফিৎ?'

আগন্তুক মাথা থেকে টুপি নামাল,'সশরীরে।'

জ্যাকসনের পাইপে তাঁর ঝকঝকে দাঁতের সারি চেপে বসল কঠিন ভাবে, 'তুমি জানো এখান থেকে পালানোর উপায় নেই তোমার। গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে কয়েক সেকেণ্ড খরচ হবে না।'

জাঁ লাফিৎ অসহিষ্ণুভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, 'আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করছেন জেনারেল। স্বেচ্ছায় ধরা দেবার বাসনা নিয়ে আসিনি এখানে। আমেরিকার দুর্দিনে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এখানে আসা। নৌযুদ্ধে আমার চেয়ে ভাল সাহায্য কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। আমেরিকান না হলেও এখন থেকে আমেরিকাই আমার স্বদেশ। আমার সব অস্ত্র-শস্ত্র, জাহাজ, একজন আমেরিকার সেবার জন্য প্রস্তুত। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমার



গ্রেপ্তারের কথা বলছিলেন, সেটা যে শর্তে সম্ভব হতো সেটা আপনার জীবনদান। আমি বন্দী হতে পারি, কিন্তু আপনিও বেঁচে থাকবেন না। দেশের সঙ্কট কালে আমরা উভয়েই সুবিবেচনার পরিচয় দিলে ভাল হয় না কি?'

জেনারেল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার কোন শর্ত আছে?'

'না। আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। এই সেবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমা কিংবা সামরিক পদমর্যাদা কিছুই চাই না।'

'গভর্নর ক্লেবোর্ন তোমার ঘাঁটির ক্ষতি করেছেন। এরপরও সাহায্য করতে চাও আমাদের?'

'গভর্নর কামান দেগে ঘাঁটি উড়িয়ে দিলেও তাই চাইতাম।'

জেনারেলের নীল ধূসর চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নরম হয়ে এল, 'বেশ তাই হবে। তোমার সাহায্য নেবো আমরা।'

আমেরিকার চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য নিয়েও ইংরেজরা সেবার হেরেছিল। তার মূলে জাঁ লাফিৎ আর তার দলবলের কৃতিত্ব কতখানি সেটা আমেরিকার ইতিহাসে সসম্মানে লিখিত হয়েছে। লাফিৎ আর তার ভাই পিয়ের, দলের ডোমিনিক ইউ, গ্যাম্বী, রেণে বেল্যুঁশ ইত্যাদিরা নৌযুদ্ধ এবং গোলন্দাজী যুদ্ধে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে আমেরিকার ভাগ্যের চাকা বেমালুম ঘুরিয়ে দিল। ইংরেজরা জাঁ লাফিৎকে দলে টানার জন্যে যে ঐশ্বর্য দিতে চেয়েছিল তাতে সে বাকি জীবনটা দাঙ্গাবাজি না করে কুবেরের মহিমায় কাটাতে পারত। কিন্তু লাফিৎ তাদের উৎকোচের হাতটাকে সবলে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি পামারস্টোনসহ ১৪০০ ইংরেজ নিহত হয়েছিল, অপর পক্ষে আমেরিকার মাত্র ১৩ জন। সামুদ্রিক লড়াইয়ে লাফিতের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাই এর কারণ।

বিনিময়ে লাফিৎ ও তার দলবল পেল গভর্নরের ক্ষমা এবং বিজয়োৎসবে পূর্ণ মর্যাদায় যোগদানের অধিকার। এমন কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় হিসেবে লাফিৎ ও তার সঙ্গীদের ওপর পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমাও প্রদর্শন করলেন।

এই ঘটনার পর লাফিতের ভাগ্যের ধারা বদলে যেতে পারত, সে ফিরে আসতে পারত ভদ্র নাগরিক জীবনে। কিন্তু বিধাতা যেভাবে তাকে গড়েছেন সে তো আসলে তাই। নীল দরিয়ার ডাক আর পণ্যবাহী জাহাজগুলির ইশারা অগ্রাহ্য করার সাধ্য কোথায় তার? আবার তার মাথার খুলি-আঁকা পতাকা-ওড়ানো খুদে ক্ষিপ্র জাহাজগুলো ভেসে গেল দূর সমুদ্রপানে, শুরু হল অবাধ লুঠতরাজ।

এদিকে তখন সাগর-সন্ত্রাস দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে সমুদ্রবাণিজ্য নিষ্কণ্টক করার জন্য স্পেন ইংলণ্ড এবং আমেরিকা সংঘবদ্ধ হয়েছে। বারটেরিয়া উপসাগরের গ্র্যাণ্ড আইল আক্রান্ত হল। প্রিয় বাসভূমি ত্যাগ করে লাফিৎ পালাল এবং উপনিবেশ স্থাপন করল গ্যালভেস্টন দ্বীপে। সেখানেও হামলা চালাল আমেরিকান জাহাজ 'লিঙ্কস'। লাফিৎকে স্থান ত্যাগের

ঃ দেশ দেওয়া হল। লাফিৎ তা মেনে নিল, কারণ দেশদ্রোহী সে হবে না কিছুতেই। তারপর নিজের হাতে গ্যালভেস্টন জ্বালিয়ে দিয়ে ভেসে পড়ল অকূল সাগরে।

পেছনে পড়ে রইল কিছু গল্প আর কিংবদন্তী যা জলদস্যুদের জড়িয়ে চিরকালই থাকে। গ্র্যাণ্ড আইলের বেত আর সাইপ্রেস ঝোপের গভীর নিম্নে যদি জমে থাকে বহু বর্ষ ধরে গড়ে তোলা রত্ন-সম্পদের ভাণ্ডার তো তা পাহারা দেবার জন্যে রইল কিছু সামুদ্রিক লিলি এবং সিন্ধুশকুনের ঝাঁক। আর জাঁ লাফিতের কীর্তিগাথা প্রচারের ভার নিল সাগরের অশান্ত বাতাস এবং দুর্দম তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

গ্যালভেস্টন ত্যাগের পরবর্তীকালে লাফিতের গতিবিধি সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার চিরকালের মত গ্রাস করেছিল তাকে। কিন্তু আমেরিকাবাসীর স্মৃতিপটে আজো সে মুখর বৃত্তান্ত। কারণ এমন একটা কাজ এই আইনবিরোধী দুর্বৃত্ত করেছিল যা জলদস্যু পরিচয়ধারী পাষণ্ডরা সাধারণত করে না। সেটা হল তার দেশপ্রেম। নিউ অর্লিন্সের যাদুঘর লাফিৎকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে তার তরবারিটিকে স্মারক হিসেবে রক্ষা করে। এটি সে ব্যবহার করেছিল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে।

জলদস্যুতার দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক নামই নানা কারণে অমর হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ড্রেক কিংবা ভাস্কো-ডা-গামার মত অনেক সমুদ্র-অভিযাত্রীই ছিলেন মূলত জলদস্যু। বিশ্বে তাঁরা বিশ্রুতনামা। সে হিসেবে জাঁ লাফিৎ প্রসিদ্ধি পায় নি। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে তার স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা আছে। দেশপ্রেমিক জলদস্যু হিসেবে সে প্রবাদপুরুষ। উঁচু দরের গ্রন্থেও বহুল আলোচিত।

কুশ যায় মামাবাড়ি

কুঁকড়োহাটির খেয়া পেরিয়ে কুশ যখন নদীর ওপারে পৌছল তখন সাড়ে ন'টা দশটা হবে। বেলা দেখে সেইরকমই ঠাহর হয়। বেরিয়েছে সাত-তাড়াতাড়ি, রাত তখনও ফরসা হয়নি ভাল করে। তারপর একঘন্টা পায়ে হেঁটে বাস ধরেছে, সেই বাস এল একটা ইস্টিশানের ধারে। সেখানে আধঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ধরতে হল আর একখানা বাস। সেটা একনাগাড়ে দু'ঘন্টা দৌড়ে থামল এসে মহেশগঞ্জে। এবার পেরোতে হল রূপনারানের খেয়া। তারপরও আরো কতো যে পথ তার ইয়ত্তা নেই।

কুশ একেবারে মুখ্যুসুখ্যু ছেলে নয়। গ্রামের স্কুলে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। বাংলা বই ভালরকমই পড়তে পারে, ইংরেজী অক্ষরও চেনে। পাড়ার গদাধর জেঠু লেখাপড়া জানা লোক, উনিই রাস্তার হদিশ বাৎলে দিয়েছেন। গোটা রাস্তার একটা ছক তৈরি করে দিয়েছেন, তার মধ্যে বাসের নম্বরও লেখা আছে। হদিশ-লেখা কাগজটা কুশের পকেটে আছে। মাঝে মাঝে সেটা বের করে দেখে নিতে হয়েছে কুশকে। এবার অনেকটা নিশ্চিন্তি, কেননা কুঁকড়োহাটির খেয়া পেরোনোর পর রাস্তার তেমন ঝক্কিঝামেলা নেই—বাসও ধরতে হবে না, নদীও পেরোতে হবে না। সবটাই হাঁটাপথ। তবে যেতে হবে অনেকদূর, খেয়া পার হবার ছ'ক্রোশ দূরে কুডুলে গ্রাম। ওই গ্রামই তার গন্তব্য।

কুডুলে গাঁয়ে কুশের মামাবাড়ি। কুশ তার চোদ্দ বছরের জীবনে এই প্রথম মামাবাড়ি যাচ্ছে। চোদ্দ বছর তো কম বয়স নয়, তাহলে এই প্রথম কুশ কেন মামাবাড়ি যাচ্ছে? কারণ মামারবাড়ি তার অনেক দূরে, অন্য এক জেলায় আর কেই বা নিয়ে যাবে তাকে? বাপ মরেছে বছর পাঁচেক আগে, সেই যেবার বান এল আর সব বাড়িঘর ফসল মাছমাছালি ধুয়ে নিয়ে গেল সমুদ্দুর-অথৈ গেরুয়া জলের তোড়। বাপের চেহারাটা ছিল অসুরের মতো, কিন্তু আধপেটা সিকিপেটা খেয়ে, না খেয়ে, রোগে ভুগে দেহ রাখল অকালে—তখন লোকটার

চুলও পাকেনি, দাঁতও পড়েনি। যার বাপ নেই, মাথার ওপর দাদা নেই, কিংবা কাকা-টাকাও নেই, তাকে কে মামার বাড়ি নিয়ে যায় ? মা নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখুধান্ধা করে আর পাঁচবাড়ি খেটেখুটে যাকে দিন চালাতে হয় তার অতো সময় কোথায়, উপায়ই বা কি ? তাছাড়া মা নিজেই তো কতকাল বাপের বাড়ি যায়নি। মা সেই যে বিশ-বাইশ সন আগে দক্ষিণদেশের কুড়ুলে থেকে উত্তুরে দেশের বাজিতপুরে এসে ঢুকেছে সেই থেকে আর যায়নি বাপ-মাকে দেখতে। ব্যাপারটা আশ্চর্যের। বাপের বাড়ির কাউকে দেখতে যেতে মায়ের কি কখনও ইচ্ছে করে না ? করে নিশ্চয়ই। তবু যায় না মা। ভিতরে কি নাকি একটা গন্ডগোল আছে, সেটা মা কখনও খুলে বলেনি, আর বাবা তো কুশের ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। মামার বাড়ি থেকে কেউ কখনও আসেনি কুশদের বাড়ি—না দাদু, না মামারা।

প্রথম দিকে কুশ ভেবেছে মামাবাড়ি বড্ড দূর তো, তাই যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি কারো পক্ষে। এ তো আর রেলরাস্তা নয় যে ইস্টিশানে এসে গাড়ি চড়ল আর হুশ করে পৌঁছে গেল। এ হল হাঁটার রাস্তা, বাস রাস্তা, নদী, আবার হাঁটা পথ। এরকম পথে পঁচিশ ক্রোশ মানে রেলরাস্তার পাঁচশো মাইল। তারপর ক্রমে ক্রমে বুঝেছে দূর বলে নয়, অন্য গন্ডগোল আছে ভিতরে যার জন্যে বিশ-বাইশ বছরেও মা দাদুকে কুড়ুলে গিয়ে প্রণাম করে আসেনি, আর বাজিতপুরে দাদু কিংবা মামাদের পায়ের ধুলো পড়েনি।

গন্ডগোলের ব্যাপারটা কুশ জানতে পেরেছে গদাধর জেঠুর কাছে। দক্ষিণ দেশে জেঠুর যাতায়াত আছে। উনি আচার্যি মানুষ, যজমানি করেন, ও-দিগরে ওঁর অনেক শিষ্য আছে। তা গদাধর জেঠু বলেছিলেন, 'তোর মামাবাড়ির লোকেরা তোদের সঙ্গে কেন সম্পর্ক রাখে না, জানিস ? সে এক বৃত্তান্ত।'

'বলো না জেঠু, শুনতে ইচ্ছে করছে।' কুশ বলেছিল।

'তোর মামাবাড়ির অবস্থা খুব ভাল। অনেক জমি-জায়গা, বাগানবেড়। যদি বলিস তোর গরীব বাপের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক হল কেন তো বলি—তোর ঠাকুর্দা এর জন্য দায়ী। লোক বড় ভাল ছিল না তোর ঠাকুর্দা। পাড়ার সব পুকুর বাগান-টাগান তোর দাদুকে দেখিয়ে বলল, 'এসব আমার।' সাবেকী আমলে অবস্থা যাদের ভাল ছিল তাঁদেরও কোঠাবাড়ি করার গরজ ছিল না তেমন। তাই তোদের সামান্য মেটে বাড়ি দেখেও তোর দাদু রাজী হয়ে গেলেন। ভাল বাড়ি না থাক, জমিজায়গাতো আছে—এই আর কি! বিয়ে হয়ে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে। তারপর তোর দাদুর কানে গেল—সব ভুয়ো, সব ফাঁকি। বাগানবেড় যা নিজের বলে দেখিয়েছিল তোর ঠাকুর্দা সব অন্যের। দাদু সেকেলে লোক তো—রাগলে দুর্বাসা মুনি! গোঁসা করে আর কখনও মেয়ের বাড়ি এলেন না, আসতেও দিলেন না কাউকে। বছর দশ বারো আগেও একবারটি তাঁর মান ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলাম। তা সেই এক কথা, মানে প্রতিজ্ঞা থেকে নড়বেন না। তারপর তো ওদিকে অনেকদিন যাওয়াই হয়নি. উনি বেঁচে আছেন কিনা তাই জানি না। এরপর কোন লজ্জায় তোর মা বাপের বাড়ি যাবে বল ? তোর মা এসব কথা বলেনি বুঝি ?'

'না।'

'তাহলে শুধিয়ে জেনে নিস সত্যি বলছি কিনা।'

মাকে জিজ্ঞেস করতেই মা ঘাড় নেড়ে বলেছে, 'তোর গদাধর জেঠু যা বলেছেন সব সত্যি।'

'তুমি যে মামাবাড়ি যেতে বলছ আমিই বা তাহলে যাব কেন ?'

মা গালে হাত ঠেকিয়ে অবাক হবার ভঙ্গি করে বলেছে, 'ওমা, ঝগড়া হল বড়তে বড়তে, তোর ঠাকুর্দা আর দাদুতে—তাতে নাতির কি ?'

'বেশ, আমি না হয় যাব। তুমিও সঙ্গে চল। একসঙ্গে যাব, বেশ হবে।'

'আমি কাজ ছেড়ে যাই কি করে ? আর অত দূর যাবার ধকল সইবে না।'

'তুমি যেন কি মা! বাপ-মাকে দেখতে যেতে ইচ্ছে করে না তোমার ?'

'করে বৈকি রে। আমার যাবার উপায় নেই বাছা। তুই একলা যা।'

'একেবারে একলা ? গদাধর জেঠুকে সঙ্গে যেতে বলব ?'

'উনি কি যাবেন ? বয়েস হয়েছে তো! উনি তো আজকাল শিষ্যবাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন শুনি। কেন, তোর একলা যেতে ভয় করবে ?'

কুশ রীতিমতো এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়িয়ে বলেছে, 'আমার অত ভয়ডর নেই।'

'এই তো ভাল ছেলের মতো কথা। গরীবের ঘরের ছেলেদের ভীতু হলে চলে না।'

'আচ্ছা মা ওরা আমাকে চিনবে কি করে ?'

'তোর বাপের নাম বলবি। তোদের পদবীটাও বলিস। তোর মামাদের পদবী দাস। তোর দাদুর নাম যুধিষ্ঠির দাস।'

কুশ সব টুকে নিয়েছে কাগজে। তারপর গদাধর জেঠুর কাছ থেকে রাস্তার হদিশ বুঝে নিয়ে, মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েছে এক সকালে। অবিশ্যি বেরিয়ে পড়ে তার ভালই লাগছে। তাকে রাস্তার নেশা পেয়ে বসেছে। এতদিন পরে দাদু-দিদিমাকে দেখতে যাচ্ছে নাতি। শুধু হাতে যায় কি করে ? মা তাই সাধ্যমতো জিনিস দিয়েছে বেঁধে। কুশের পুঁটুলিতে নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, নলেন গুড়ের পাটালি,চাল-কড়াই ভাজা, বাড়ির তৈরী মুড়কি, এইসব গেরস্থের জিনিস। গ্রামবাংলার গরীব মানুষেরা কুটুমবাড়ি গেলে এরকম জিনিসই নিয়ে যায়। কুশদের আর কি আছে দেবার মতো ?

কুঁকড়োহাটি গঞ্জমতো জায়গা। অনেক দোকানপসার। কুশের খিদে পাচ্ছিল। হাঁটতেও তো হবে অনেকখানি। ছ'ক্রোশ সে কখনও হাঁটেনি একনাগাড়ে, তাই দূরত্বটা সম্পর্কেসঠিক ধারণা নেই। তবে তার লম্বাটে রোগা রোগা পায়ে হরিণের গতি, বাতাসের আগে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ওই এক ঝামেলা—খালি পেটে সে হাঁটতে পারে না।

খুঁজে খুঁজে একটা মুড়ি-তেলেভাজার দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুড়ি-বেগুনি চিবোতে চিবোতে বুড়ো দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলো, 'এদিকে কুড়ুলে বলে গ্রাম আছে ? কদ্দূর ?'

দোকানদারের ভারী মুখটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কুশের দিকে।

বলল, 'তুমি কুড়ুলে গ্রামে যাবে নাকি? একলা?'

'হ্যাঁ।'

'পশ্চিমদিকে ছ'ক্রোশ। দুটো প্রকান্ড মাঠ, তারপর চার চারটে গ্রাম। নলহাটি, টিয়াপুর, বাকুলি, কাশমূলী, তারপর গিয়ে কুড়ুলে। গাঁয়ের ক্রোশ ডালভাঙা ক্রোশ, বুঝলে? এখানের ক্রোশ ক্রোশের চেয়েও লম্বা। তা বাড়ি কোথায়? এদিকে নয় বুঝি?'

'না, হাওড়া জেলায়। খেয়া পেরিয়ে অনেক দূর।'

'ছেলেমানুষ একা বেরিয়েছ, যাচ্ছো কার কাছে?'

'মামাবাড়ি।'

'পৌঁছতে বিকেল কি সাঁঝ। এদিকটা এখন খারাপ হয়ে গেছে। সাবধানে যেও। না বাপু, তোমার মতো বাচ্ছা ছেলেকে কি বলে যে একলা ছেড়ে দিয়েছে ভেবে পাই না।'

বুড়োর বকবকানি থামিয়ে দিয়ে কুশ শুধলো, 'এদিকটা খারাপ হয়ে গেছে না কি যেন বলছিলেন? তার মানে?'

'বানে ভেসে গিয়েছিল তো। সাংঘাতিক বান। লোকের ঘরে কিছু নেই, তাই স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছে—এই বলছিলুম আর কি।' এর বেশি কিছু বলতে চাইলো না দোকানদার।

খাবারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কুশ। মনটা ওর খচ্‌খচ্ করছিল দোকানদার বুড়ো কি বলতে গিয়েও চেপে গেল না! অবশ্য কুশ শিগগিরই অন্য ভাবনায় ডুবে গেল। ছোটরা একরকম ভাবনা নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

মায়ের কথা ভাবতে লাগল সে। দুঃখ-কষ্টের ভেতর মানুষ হয়েছে কুশ। ভাল খাবার দাবার শুধু চোখেই দেখেছে, চেখে দেখেনি। এদিকে মামাবাড়ির আদর-যত্ন নিয়ে কতো কথাই সে শুনেছে আর বইয়ে পড়েছে। সেরকম আদর-যত্ন জুটবে তো নিজের মামাবাড়িতে?

না জোটার কারণ নেই। মা বলেছে তার মামাবাড়ির মস্ত অবস্থা। অনেক পুকুর, বাগানবেড়। নারকেলবাগান, আমকাঁঠালের বাগিচা, মাছ কিনে খেতে হয় না, দুবেলা গাই আছে। ধানের গোলা শস্যে টইটুম্বুর। শুধু তিনমহলা কোঠাবাড়ি নেই, আর দুয়োরে হাতি বাঁধা নেই। দিদিমা বেঁচে থাকলে নাতির আদরের শেষ থাকবে না। এই প্রথম যাচ্ছে, কতোদিন আটকে রাখে তার ঠিক কি! কুশ নিজের মনে ভাঙে গড়ে আর পথ চলে।

হাঁটতে লাগল, হাঁটতেই লাগল কুশ। রাহী লোককে কতবার যে পথের হদিশ শুধোতে হল তার লেখাজোকা নেই। বেশ ক'বার গাছের ছায়ায় বসল, জল খেল জলাশয় থেকে। মাঠ আর গ্রাম, গ্রাম আর মাঠ পার হয়ে চলল। এখন অঘ্রান চলছে। কিন্তু দু'ধারের মাঠ ফসলশূন্য। শীতের হাওয়ায় কোথাও ধানের শীষ দুলছে না। ক'মাস আগের বর্ষায় এসব দিকে যে বানভাসি হয়েছিল ফাঁকা মাঠের চেহারা দেখেই তা মালুম হয়। ফাঁকা মাঠ দেখে দুঃখ হচ্ছিল চাষীর ছেলে কুশের।

সূয্যিঠাকুর যখন পাটে বসতে চলেছে আর কুশের পা দুটো বিষফোঁড়ার মতো ব্যথিয়ে

উঠেছে, যখন একটা রাখাল ছেলেও নেই কোথাও যে জেনে নেবে কুড়ুলে আর কতদূর, তখন পথ তাকে পৌঁছে দিল একটা ঝাঁকড়া অশ্বথের তলায় যার দু'দিকের মাঠে মাথা উঁচু খড়িবন। একটা পাখিও ডাকছে না কোনখানে। অশত্থের তলা ঘন ছায়ায় ভরা, যেন আঁধার নেমেছে। জন মনিষ্যি নেই কোথাও, অথচ আশ্চর্য, গাছতলার মাটি ফুঁড়ে কোত্থেকে যেন দু'জন বিচ্ছিরি চেহারার মানুষ বেরিয়ে এল। নিবু নিবু বিকেলের আলোয় কুশ দেখল একজনের চেহারা লম্বা, হাল্কা-পল্কা; অন্যজন বেঁটে খাটো, তার শরীরের কাঠামো হাড়ে-মাসে শক্তপোক্ত। একজনের বয়স তিরিশ তো অন্যজনের চল্লিশের মতো। দু'জনের হাতেই তিন গাঁটের লাঠি—আধমানুষ প্রমাণ।

লম্বা লোকটা গম্‌গমে গলায় কুশকে বলল, 'অ্যাই, তোর কাছে কি আছে দিয়ে দে।'

কুশ ঘাবড়ে গিয়েছিল বৈকি। আর একটু অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সে ওদের মানুষ ছাড়া আর কিছু মনে করত। কুশ বুঝল এরা মানুষ, কিন্তু ভাল মানুষ নয়। একটি কথাও না বলে সে ওদের হাতের পুঁটুলিটা এগিয়ে দিল। কুঁকড়োহাটির খেয়া পার হবার পর গঞ্জের সেই দোকানদার বুড়ো যে বলেছিল—'লোকের ঘরে কিছু নেই, তাই স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছে'—কথাটা মনে পড়ে গেল কুশের।

পুঁটুলিটা খুলে সিড়িঙ্গে লোকটা বলল, 'তিলের নাড়ু, পাটালি, মুড়কি—আহা রাজভোগ। কতোদিন এসব খাইনিরে।' এই বলে সে গরাসে গরাসে খেতে লাগল।

বেঁটে লোকটা এই দৃশ্যের নীরব দর্শক থাকবে আশা করা যায় না। সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল পুঁটুলির ওপর। তারপর দু'জনে যেভাবে হাউ-মাউ করে খেতে লাগল সে কেবল বক-রাক্ষসের গল্পেই শোনা যায়। নিমেষে চেটে পুঁছে পুঁটুলি সাফ করে দিল ওরা।

লম্বা লোকটা মস্ত একটা ঢেকুর তুলে বলল, 'বাঃ, বেশ খাওয়া গেল। কচু ঘেঁচু খেয়ে মুখ একেবারে হেজে গিয়েছিল, নারে শামু?'

'যা বলেছ দামুদা।' সায় দিল বেঁটে মানুষটা।

কুশ একপাশে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর ওপর চোখ পড়াতে বেঁটে লোকটা ঢাঙার দিকে চেয়ে বলল, 'এবার একে নিকেশ করে দিই? সামনেই একটা পানাপুকুর আছে, ওখানে গতি করে দিলে কাকপক্ষীতেও টের পাবে না।'

এই বলে হাতের তিন গাঁটের লাঠিটা সপাটে উঁচিয়ে ধরতেই ঢ্যাঙা হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'করিস কি! দেখছিস না বাচ্চা ছেলে! এদেশে নতুন মনে হচ্ছে। নইলে এ-দিগরে আসত নাকি? অ্যাই, তুই কোত্থেকে আসছিস রে?'

কুশ বাড়ির ঠিকানা বলল। সাকিন বাজিতপুর, জেলা হাওড়া। আর যাবে সে মামাবাড়ি।

'মামাবাড়ি কোন্ গাঁ?'

'কুড়ুলে।'

'কুড়ুলে!' লম্বা লোকটা এবার যেন থমকে গেল, 'মামার নাম কি?'

'মামাদের নাম মনে নেই। দাদুর নাম যুধিষ্ঠির দাস। আমি বাজিতপুরের পবন মন্ডলের

ছেলে।'

ঢ্যাঙা আর বেঁটের মধ্যে চোখাচুখি হল। ঢ্যাঙা তার চড়া গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বলল, 'তুই তাহলে যুধিষ্ঠির দাসের নাতি ? যাক্ গে শোন। সামনেই কুড়ুলে। এই রাস্তা ধরে আধ মাইলটাক গেলে একটা মেটে বাড়ি পাবি জোড়া বট-পাকুড়ের নিচে। ওটাই তোর দিদিমার বাড়ি।' এই বলে দু'জন লোকই অশথের ঘন ছায়ায় এমনভাবে হাওয়া হয়ে গেল যে চোখে দেখেও চোখের ভুল বলেই মনে হবে।

কুশ আর দাঁড়ায়! 'খুব বেঁচে গেছি'—এই বলে সে দৌড়তে শুরু করল। তার সরু লম্বা পা দুটো হরিণ-পা হয়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। রাস্তার ধারে মেটে বাড়ি, তার ওপর ছায়া দিচ্ছে বট-পাকুড়ের ডালপালা—সেরকম নিশানায় এসে তবে সে দম ফেলল। তারপর বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাতে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দিদিমা, ও দিদিমা, দরজা খোল তাড়াতাড়ি।'

'এই ভর-সন্ধ্যেয় কে রে'—বলতে বলতে যে শণনুড়ি চুলের বুড়িটা বেরিয়ে এল তার মুখে হাজারো বয়সের আঁক সত্ত্বেও কুশ বুঝতে পারল তার মায়ের বয়স পঁয়ষট্টি-সত্তর হলে এমনই দেখতে হবে।

কুশ ঢিপ করে দিদিমাকে প্রণাম করে বলল, 'আমি বাজিতপুরের পবন মন্ডলের ছেলে।'

'তুই আমার ফুলবাসীর পুত্তুর! নাতি আমার ?' এই বলে যে নাতিকে আগে কোনদিন দেখেনি তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল বুড়ি।

তারপর দু'দিন গেল, চারদিন গেল—বুড়ি ছাড়তে চায় না নাতিকে। খুদকুঁড়ো যা জোটে তাই দিয়েই আদর যত্নে ঢেকে দেয়। সারাদিন এটা রাঁধে, ওটা বানায়। সে সব সামান্য তুচ্ছ খাবার, কিন্তু দিদিমার হাতের গুণে আর মুখের সুধায় তাই যেন অমৃত হয়ে ওঠে। তারপর সন্ধে হলে পিদিম জ্বেলে, ঘরে আগল দিয়ে বসে পুরনো দিনের গল্প শোনায়। তা সে সব গল্পও বড় মধুর।

তা নয় হল, কিন্তু মামাবাড়ি নিয়ে কুশ যে এত গল্প শুনেছে মায়ের মুখে সে-সবের তো কিছু হদিশ মিলছে না। বাড়ি বলতে উঁচু ভিটের ওপর সাকুল্যে দু'খানা মেটেঘর, তার মধ্যে একটা তো রান্নাঘর। চারধারে পাঁচিল নেই। এরকম বাড়ি তো গরীব মানুষেরই হয়। আর বাগ-বাগিচা ক্ষেত পুকুর—সে সব তো চোখেও দেখল না। দাদু না হয় বেঁচে নেই, মামারা কোথায় গেল ? দিদিমা একলাই তো দেখা যাচ্ছে ভিটে জাগিয়ে বসে আছে!

কুশ আর থাকতে না পেরে শুধোয়, 'তোমাদের নাকি মাঠকোঠা বাড়ি, অগুণতি নারকেল, আম, কাঁঠাল গাছ, পুকুরভরা মাছ, ধানের গোলা ছিল, সেসব কোথায় গেল ? ওসব গপ্পো কথা নাকি ?'

'বালাই ষাট, গপ্পো হতে যাবে কেন ? ছিল তো। এখন নেই। তোর দাদু চলে গেলে তোর দু'মামা সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলে। আমার সঙ্গে রাগারাগি করে অন্য জায়গায় বাড়ি করলে। তোর মামারা মানুষ হয় নি, কুঁড়ের বাদশা। খাটবে না, খুটবে না, পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে আর ঘন্টায় ঘন্টায় খাবারের অর্ডার করবে। রাক্ষসের খিদে। এরকম

করলে বিষয়-সম্পত্তি থাকে ? সব জলের দরে বেচে দিয়ে পেটে পুরেছে। আমাদের পুরনো বাড়ি কত সুন্দর মাঠকোঠা ছিল! দামী কাঠের দরজা-জানালা, ছ'খানা এই বড় বড় ঘর, দেওয়ালে কারুকাজ। তোর দাদুর মুখ থেকে শুনেছি বিষ্টুপুর থেকে কারিগর এসে দেওয়ালে দেবতাদের মূর্তি এঁকেছিল—তোর দাদুর খুব উঁচু নজর ছিল কিনা—তা সে বাড়ি .. বছর দশেক আগের বানে পড়ে গেল! তোর দাদু খুব দুঃখ নিয়ে মরেছে। সেই বড়ো ব..নের পরই দুঃখে শোকে চলে গেছে মানুষটা। তারপর থেকেই এই কুঁড়েঘর। তোর মামারা এই গাঁয়েই আছে। কিন্তু বুড়ি মাকে একবারটি চোখের দেখাও দেখতে আসে না।'

কুশ অবাক হয়ে বলে, 'এই গাঁয়েই আছে, তবু আসে না! বল কি ?'

'তবে আর বলছি কি! আসবে কোন লজ্জায়! সব যে খুইয়ে বসে আছে। ওরাও ভাল নেই, কষ্টেই রয়েছে। তারপর এবছর আবার প্রকান্ড বান হয়ে গেল, সবই তো ভেসে গিয়েছে। দুঃখে কষ্টে ওদের স্বভাবটাও নষ্ট হয়ে গেছে। সবই তো কানে আসে।'

দিদিমা কতকাল পরে কথা বলার লোক পেয়েছে—কথা ফুরোতেই চায় না। কুশও সেই কথা যেন শুষে নেয় তেষ্টা-পাওয়া মানুষের মতো। এভ..বে দিন যায় দিনের মনে।

তারপর এক সকালে নাতিকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বলল, 'ফুলবাসীকে কতকাল দেখিনি, তোকে দেখে বুক ভরে গেল। আদরযত্ন করতে পারলুম না—কি দিয়ে করব, কি-ই বা আছে আমার! তোর মা ভাবছে তোর জন্যে। ইচ্ছে করে আরো কদিন কাছে রাখি, তবু তোর মায়ের কথাটাও তো ভাবতে হবে! সুদিন পড়লে আবার আসিস। এবার খালি হাতে আসতে পারবি না। তিলের নাড়ু, নারকেলের সন্দেশ, কাসুন্দি, নলেন গুড়ের মুড়কি অনেককাল খাইনি রে। কিন্তু ততোদিন বাঁচব কি ?', এই বলে ফোকলা মুখে হেসে ফেলল বুড়ি।

রাস্তায় পা বাড়িয়ে কুশ বলল, 'সবই তো এনেছিলুম, ডাকাতে কেড়ে নিলে যে!'

দিদিমা আগেই ঘটনাটা শুনেছিল। বলল, 'হ্যাঁ, এদিকে সবই চোর-ছ্যাঁচোড় হয়ে গেছে।'

হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল এমনিভাবে কুশ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দিদিমা, এদিকে দামু-শামু বলে কেউ আছে ?'

বুড়ি চমকে উঠে বলল, 'তুই ওদের নাম জানলি কি করে ?'

'বলই না ওরা কারা ?'

'ওরা হল দামোদর আর শ্যামলাল। তোর বড়ো মামা আর ছোট মামা। ওদেরই ডাকনাম দামু-শামু। ওদের দেখলি কোথায় ?'

কুশ উত্তর দিতে গিয়েও চুপ করে গেল। মামারা যে ডাকাত হয়ে গিয়েছে আর তার সব কেড়ে নিয়েছে—একথা বলে দিদিমার মনে কষ্ট দিতে তার মন সরল না। দিদিমাকে ঠক্ করে একটা প্রণাম করে বলল, 'কাল রাতে ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে বকছিলে, তার মধ্যেই ওদের নাম শুনতে পেয়েছিলুম।'

এই বলে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করে দিল কুশ।

বলরাম বৃত্তান্ত

বলরাম হাড়ী কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। লোকসাহিত্যের গবেষক ছাড়া খুব বেশি লোক তাঁর নামও জানে না। নিতান্ত অন্ত্যজের ঘরে জন্ম। কেতাবী শিক্ষা লাভের সুযোগও হয়নি। ছেলেবেলাটা কেটেছে, যেমনভাবে হাড়ী বাগ্দী ডোমের ঘরে কাটে। তবে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মতো অন্তরে ভক্তিভাব নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর তারই জোরে উদার মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ক্ষেত্রে বলরাম একটি বিশেষ নাম।

তাঁর অনুগামীরা বলরামী বা বলাহাড়ী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। নদীয়া জেলায় তাঁর সাধনপীঠ অনেকের কাছেই দ্রষ্টব্য স্থান। তাঁর স্মরণে প্রতিবছর সেখানে মেলা বসে থাকে। নানা অঞ্চল থেকে বলরামীরা সেখানে সমবেত হন। আউলবাউলদের সমাবেশ হয়। শহর থেকে নানা স্তরের গুণীরাও যান সেখানে।

বলরামের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিচিত্র সব কাহিনী, কিংবদন্তি। একজন অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষ ঘটনার নানান ঘাত-প্রতিঘাতে কিভাবে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন, ঘটনাগুলিতে তার আভাস মিলবে।

।।এক।।

মেহেরপুরের চন্দ্রমোহন মল্লিক ডাকসাইটে জমিদার। প্রজাবৎসল ভূস্বামী হিসেবে তাঁর প্রচুর সুনাম। অজস্র সৎকাজ করেছেন। শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, দিঘি খনন, পথ নির্মাণ ও সংস্কার—বহু ভাল কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন চন্দ্রমোহন। তবে তাঁর বিশ্বাস কুলদেবতা আনন্দবিহারীর মন্দির গড়াই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

মন্দিরটি এককথায় অনবদ্য। এটিকে নিখুঁত করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি চন্দ্রমোহন। তোষাখানা উজাড় করে দিয়েছেন। যেমন আয়তন, তেমনি উচ্চতা। সেই অনুযায়ী গঠন-কারুকার্য। গম্বুজের চুড়োটা যেন আকাশের গায়ে গিয়ে ঠেকেছে। চুড়োর ওপর পিতল

কলসের শোভা স্বর্ণকলসের ভ্রম আনে। প্রভাতসূর্যের আলোয় মন্দিরের মর্মরশুভ্রতা সৃষ্টি করে এক অপার্থিব সৌন্দর্য। দেখে দেখে আশ মেটে না চন্দ্রমোহনের।

মন্দিরের মধ্যে আনন্দবিহারীর অষ্টধাতুর মূর্তি। গুজরাট থেকে বিখ্যাত প্রস্তরশিল্পী আনিয়ে এই মূর্তি গড়িয়েছেন চন্দ্রমোহন। বিগ্রহের অঙ্গে রাশি রাশি স্বর্ণালঙ্কার। সেগুলিতে মণিমুক্তো বসানো। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত সোনা ও জড়োয়ার অনেকটাই চলে গেছে বিগ্রহসজ্জায়।

তখন ইংরেজ আমল। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে সরকারি প্রশাসন ছিল শিথিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রবের শেষ ছিল না। ডাকাতের ভয়ে থানাদাররা পর্যন্ত তটস্থ থাকত। লাঠিয়াল-পাইক-বরকন্দাজ বাহিনী নিয়েও জমিদারদের রাতে সুনিদ্রা হত না।

ডাকাতরা জানত, যে মন্দিরের সুনাম যত, রত্নালঙ্কারও তার ততই। মন্দিরের দেববিগ্রহই তো এক স্বর্ণখনি। কালীমন্দির ছাড়া সব মন্দিরই লুঠপাট করত ডাকাতেরা।

এসব তথ্য জমিদার চন্দ্রমোহনের অজানা নেই। তাই মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। মন্দির রক্ষার ভার কাকে দেবেন? খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া চাই। ধার্মিক বা ধর্মভীরু হলে আরো ভাল। তাদের অন্তত একটা নীতিবোধ থাকবে। দেবতার শুচিতা রক্ষার জন্য জান কবুল করবে তারা।

কিন্তু এমন লোক মেলা দুষ্কর। পাইক-বরকন্দাজদের মধ্যে শক্তিশালী লোকের অভাব নেই, কিন্তু তাদের বিশ্বাস করা কঠিন। ডাকাতদের সঙ্গে ষড় করে মন্দির লুঠ করানো তাদের পক্ষে আশ্চর্য কিছু নয়।

সুযোগ্য পাহারাদারের খোঁজে লোক লাগালেন চন্দ্রমোহন। এল অনেকে। কিন্তু কাউকেই তাঁর মনে ধরল না।

এমন সময় কানে এল একটি অচেনা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। লোকটিকে আনার আদেশ দিলেন।

এল লোকটি। সাদাসিধে চেহারার একজন প্রৌঢ়। প্রায় আভূমি নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল, —আমার নাম সুদাম হাড়ী। মন্দির পাহারা দেবার জন্যে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছেন শুনলুম। তা সেরকম লোক আছে আমার হাতে।

শুধু বিশ্বাসী হলে চলবে না। ধর্মকর্মের দিকে মতি থাকা চাই।—চন্দ্রমোহন বললেন।

—আজ্ঞে, ঠাকুর-দেবতা ছাড়া সে কিছু বোঝেনা। অন্য দিকেও তার এলেম আছে।

—কিরকম?

—লাঠিখেলায় ছোকরা ওস্তাদ। তীরন্দাজগিরির হাতও খুব পাকা। গায়ে তাগদ আছে। তলোয়ার ধরতেও জানে।

—তা ছোকরাটি কে? থাকে কোথায়?

—আমার ভাইপো সে। নাম বলরাম। আমরা থাকি কোশখানেক দূরে নদীর ধারে এক গ্রামে। গ্রামের নাম, গোপালপুর।

—বেশ, নিয়ে এসো তোমার ভাইপোকে। আগে তাকে দেখি, একটু বাজিয়ে নিই। তারপর

পাকা কথা দেবো।

প্রথম দর্শনে চন্দ্রমোহন বলরামকে প্রায় নাকচ করে দিতেই চেয়েছিলেন। আসলে খুঁটিয়ে না দেখলে তার চেহারাটা তেমন নজরে পড়ে না। ভোজপুরী দারোয়ানদের কুস্তিভাঁজা শরীরও নয়, আবার পেশীবহুল প্রশস্ত দেহাকৃতিও নয়। উচ্চতায় মাঝামাঝি, তেলপাকানো লাঠির মতো শক্ত আর ছিপছিপে শরীর। মুখের ভাবে কোনরকম উগ্রতা নেই — যা হাড়ীজাতীয় লোকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। চোখের দৃষ্টি সরল, নরম।

চন্দ্রমোহনের চোখ জহুরীর চোখ। তাঁর মনে হল মানুষটা নিতান্ত হেলাফেলার নয়।

তবে জমিদার মানুষ তিনি, পরীক্ষায় সন্তুষ্ট না হলে কারো হাতে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তুলে দিতে রাজি নন। তা পরীক্ষা তিনি নিলেন। পাইক-সর্দারের সঙ্গে বলরামকে এক হাত লাঠি খেলতে বললেন। লাঠিবাজিতে সর্দারের যথেষ্ট নামডাক।

সর্দার খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শুরু করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝল বড় কঠিন লোকের পাল্লায় পড়েছে সে। বলরাম সবার সামনে সর্দারকে হারিয়ে দিয়ে সর্দারের অসম্মান করল না। তবে এমন সাবলীল দক্ষতায় সে আত্মরক্ষা এবং প্রত্যাঘাতের কাজটা চালাতে লাগল যে, বুঝতে কারো বাকি রইল না ইচ্ছে করলেই সে সর্দারকে ধরাশায়ী করতে পারে।

একসময়ে খেলা থামানোর আদেশ দিলেন চন্দ্রমোহন। যা বোঝবার তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছে, লাঠির এমন জাদু আগে কখনও দেখেননি তিনি। সুদাম হাড়ীকে ডেকে বললেন,— যেমন লোক চাইছিলাম, তোমার ভাইপো সেইরকমই। হ্যাঁ, ও পারবে, তবে একটা কথা। মন্দির ও পাহারা দেবে ঠিকই, তবে ভেতরে ঢোকার ওর অধিকার থাকবে না। উচ্চবর্ণের লোকেরা যাতে অসন্তুষ্ট না হয়, —তার জন্যই এই ব্যবস্থা। সেই দিন থেকেই বলরাম মন্দির রক্ষকের কাজে বহাল হয়ে গেল। আর অল্পদিনের মধ্যেই সে সকলের মন জয় করে নিল।

।। দুই ।।

বলরামের কাজ রাতের বেলায়। দিনের বেলা তেমন কাজ নেই। ইচ্ছে করলেই এখানে-ওখানে যেতে পারে, কিংবা বাড়ি ঘুরে আসতে পারে। কিন্তু বলরাম ছুটি নেয় না। সে অষ্টপ্রহর পড়ে থাকে মন্দিরের বাইরে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটিতে।

বেলা এগারোটা নাগাদ পূজা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। পূজা কিংবা আরতির সময় লোকের ভিড় লেগেই থাকে। জমিদারের পরিবারস্থ লোকজন পূজা দেখতে তো আসেই, পল্লীর ভদ্র পরিবার থেকেও আসে অনেকেই। বলরাম সবার ওপর নজর রাখে। কার মনে কি আছে কে বলতে পারে? চোরেরা দিনের বেলাতেও কাজ সারতে পারে। ডাকাতদের সম্বল গায়ের জোর, চোরেরা কাজ সারে কৌশলে। কৌশলের মোকাবিলা করতে গেলে সতর্ক-সজাগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। বলরাম তাই দিনের বেলাতেও সতর্ক।

পূজার পর প্রধান সেবাইত মন্দিরে তালা ঝুলিয়ে চলে গেলে ঘন্টা দেড়েকের জন্যে অবসর নেয় বলরাম। মন্দিরের কাছেই একটা কুঁড়েঘর তৈরি করে নিয়েছে থাকার জন্যে। সেখানে সে স্বপাক রান্না করে খায়। নিরামিষ। রান্না, স্নান, আহার— এসবের জন্যে ঘন্টা

দেড়েকের মতোই তার লাগে। বাকি সময় বেঁটে মোটা একটা লাঠি নিয়ে একটা থামের পাশে পাথুরে মূর্তির মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রমোহন ওর কাজে খুবই খুশি। এতখানি কর্তব্যবোধ তিনি আশা করেন নি।

হাজার হোক, মানুষের শরীর। দিনরাত জেগে থাকলে শরীর ভেঙে পড়ার কথা। তাই চন্দ্রমোহন একদিন বলরামকে বললেন, — বেলা এগারোটার আগে পূজা শুরু হয় না, লোকজনও আসে না। সকালের দিকটা তুমি ঘুমিয়ে নিতে পার।

—সকালে আমার ঘুম হয় না হুজুর। অভ্যেস নেই।

—তাহলে ঘুমোও কখন? ঘুম না হলে মারা পড়বে যে!

—সন্ধের পূজার পর ঘণ্টা দু'আড়াই ঘুমিয়ে নিই।

—কিন্তু রাত-পাহারার জন্যেই তো তোমাকে রাখা হয়েছে।

—চোর-ডাকাতদের একটা নিয়ম আছে। নিষুত রাত ছাড়া চোরেরা বেরোয় না। ডাকাতদের অবিশ্যি অতো বাঁধাবাঁধি নেই। তারা এলে তো জানিয়েই আসবে। তাতে শুধু ঘুম ছুটে যাওয়া কেন, মরা মানুষও জেগে উঠবে। ডাকাত সামলাবার জন্যে তো লোক আছে আপনার। আমি শুধু চোর সামলাই। পাকা চোরেরা সাত-সন্ধেয় আসে না।

—তা বটে।

কেবল সন্ধেরাতে নয়, শেষ রাতেও বলরাম মন্দিরে থাকে না। ভোর ভোর সে মন্দির ছেড়ে চলে যায়। সিকি মাইলটাক দূরে একটা জঙ্গলমতো জায়গা আছে। সেখানে গিয়ে সে একা একাই লাঠি খেলার অনুশীলন করে, তীরন্দাজির কসরত চালায়। অভ্যেস না থাকলে সব বিদ্যেই ক্ষয়ে যায়, সে জানে।

শতচক্ষু না হলে জমিদারি চলে না। চন্দ্রমোহনেরও অনেক চোখ। তাঁর তো লোকলস্করের অভাব নেই। তারাই তাঁর চোখ। তাদের মুখেই খবর-পেলেন, বলরাম ভোরের দিকে মন্দিরে থাকে না, জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

বলরামকে ডেকে চন্দ্রমোহন বললেন, — ভোরবেলায় মন্দির ফাঁকা থাকে, তুমি নাকি তখন কোথায় চলে যাও?

বলরাম দণ্ডবৎ হয়ে বলল, — যাই আজ্ঞে। ওটা আমার অভ্যেস। বরাবরের অভ্যেস।

— কিরকম?

—চিরকাল ভোরবেলায় লাঠি আর তীর নিয়ে কসরত করে আসছি। অভ্যেসটা ছাড়ি কি করে হুজুর?

— ভোররাতে মানুষের নজর চলে?

— শেয়ালের চলে, খটাসের চলে — মানুষের কেন চলবে না? অভ্যেসে সবই হয়। মহাভারতে রাতের বেলায় যুদ্ধের কথা আছে না, হুজুর?

চন্দ্রমোহন মহাভারত যত্ন করেই পড়েছেন। বললেন, --- আছে। তাকে বলে সৌপ্তিক।

মানে রাতের যুদ্ধ।

—তবেই দেখুন, রাতেও যুদ্ধ হত। আর তাতে তীর-ধনুকের ব্যবহার হত।

চন্দ্রমোহন হেসে বললেন, — তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। অনেক কিছু জানো দেখছি। তবে তোমার অভ্যেসগুলো একটু অদ্ভুত। শুনি তুমি নাকি আমিষ ছোঁও না। কেন?

—আমার ভাল লাগে না। নিরামিষ তো সব দিক থেকেই ভাল। ওতে ঝামেলা অনেক কম।

— তুমি দেখছি অদ্ভুত মানুষ। তা হ্যাঁ হে, এই যে মন্দিরে তোমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, এজন্যে তোমার মনোকষ্ট হয় না?

— আজ্ঞে না। আনন্দবিহারী আমার বুকের মধ্যে আছেন, বাইরে না-ই বা দেখলাম!

— বাঃ, বেশ কথা। বলছিলাম কি, তোমার ওই ভোরবেলায় বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে অনেকে অনেকরকম বলছে। তুমি যে লাঠিবাজি আর তীরন্দাজিতে আরো পাকা হচ্ছ তা দেখাতে হবে সবাইকে। নাহলে লোকের মুখে হাতচাপা দেওয়া যাবে না।

—সময় হলেই এর প্রমাণ দেব হুজুর।

তা প্রমাণ দিয়েছিল বলরাম। আনন্দবিহারীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে চন্দ্রমোহন তিনদিন ব্যাপী মেলার আয়োজন করেছিলেন। মেলার শেষ দিনে শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন, লাঠিখেলা আর তীরন্দাজির নৈপুণ্য দেখানোর আয়োজন ছিল। প্রতিযোগিতামূলক আয়োজন। লাঠি আর তীরে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে বলরাম সহজেই পুরস্কার জিতে নিল।

লোকের মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে পড়ল বলরামের। চন্দ্রমোহন বললেন, — সাবাস বলরাম। লাঠি আর তীর তোমার হাতে সার্থক।

এদিকে বলরামের শত্রুও বাড়ল। গুণী মানুষের গুণ গাওয়ার লোকের যেমন অভাব হয় না, তেমনি বদনাম গাওয়ার লোকেরও অভাব ঘটে না। চিরদিনই এ-ব্যাপার চলে আসছে পৃথিবীতে।

চন্দ্রমোহন স্বহস্তে বলরামকে মেলার মধ্যে পুরস্কৃত করেছিলেন। একখানা ধুতি, এক জোড়া গামছা, একটি রৌপ্যপদক। পদকটি নিজের হাতে বলরামের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। পরশ্রীকাতর ও ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা বলল — জমিদারবাবু বলরামকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন! এতটা ভাল নয়। ওই বলরামই একদিন ফাঁসাবে।

এদের মধ্যে যারা লাঠিবাজি আর তীরন্দাজিতে বলরামকে এঁটে উঠতে পারেনি, সেইসব পাইক-বরকন্দাজও ছিল। বলরামের প্রতিপত্তি তাদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠেছিল।

।। তিন ।।

আনন্দবিহারীর মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় জলের মতো অর্থব্যয় করেছিলেন চন্দ্রমোহন। এছাড়া অন্যান্য সৎ কাজেও ব্যয়ের সীমা-পরিসীমা তাঁর ছিল না। এর অনিবার্য পরিণাম হল ভাঁড়ার শূন্য হয়ে যাওয়া। কার্যত ঘটলও তাই। এদিকে ঠাটবাট বজায় রাখতেও কম খরচ হচ্ছিল না। একসময় চন্দ্রমোহন দেখলেন কোষাগারের চেহারা দীনহীন হয়ে পড়েছে।

বিপদের ওপর বিপদ। এই সময়েই বাবু বিশ্বনাথের চিঠি এসে পৌঁছল তাঁর কাছে। নায়েবমশাই একটি হাত চিঠি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, — একটি লোক একটু আগে দিয়ে গেল। অচেনা লোক, আগে কখনও দেখিনি। বললে খুব জরুরী চিঠি। এটা দিয়েই চলে গেছে লোকটা।

জরুরীই বটে! বাবু বিশ্বনাথের চিঠির চেয়ে আরো জরুরী কোন চিঠির কথা গত শতাব্দীর নদীয়া জেলার লোক ভাবতেই পারত না। চন্দ্রমোহন হাতচিঠিটা খুলেছিলেন। কিন্তু পড়তে পড়তে তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল, হাত কাঁপতে লাগল থর্‌থর্ করে।

চন্দ্রমোহনের ভাবান্তর নায়েব মশাইয়ের নজর এড়ায়নি। উৎকণ্ঠিতভাবে শুধোলেন, — কিসের চিঠি? কে লিখেছে?

চন্দ্রমোহন কম্পিত হাতে খোলা চিঠি এগিয়ে দিলেন, — পড়ে দেখুন।

পড়লেন নায়েবমশাই। চিঠিতে লেখা আছে, —

মহাশয়, সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকায় আপনি লোক মারফত চৌধুরী জাঙাল সংলগ্ন চত্বরে পাঁচ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। কথার খেলাপ হইলে সমূহ বিপদ জানিবেন। অকারণ রক্তপাত আমি পছন্দ করি না। কিন্তু আমার কথামতো কাজ না হইলে আমার তুল্য সাক্ষাৎ শমন আর কেহই নাই, ইহাও মনে রাখিবেন। আপনার ভবন ও মন্দির লুণ্ঠিত হউক ও প্রিয়জনদের প্রাণবিয়োগ ঘটুক, নিশ্চয়ই ইহা আপনি চাহিবেন না। অবশ্যই অবগত আছেন যে বাবু বিশ্বনাথ মনে-মুখে এক। নির্দেশ পালনকারীর সে কখনও ক্ষতি করে না। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে আপনার লোককে অভ্যর্থনার জন্য সদলে উপস্থিত থাকিব।

বিনীত
বিশ্বনাথ দাস

বিশ্বনাথ দাস, বিশ্বনাথবাবু, বাবু বিশ্বনাথ আসলে বিশে ডাকাতের নামের রকমফের। নিজেকে সে বাবুলোক বলেই মনে করত এবং তার চালচলনও ছিল বাবুলোকের মতই। ডাকাত বলতে যেরকম কুদর্শন, গালপাট্টাওয়ালা রক্তচক্ষু মানুষের ছবি ভেসে ওঠে বিশে ডাকাত সেরকম ছিল না। ডাকাতি করতে বেরোলেও সে আসত পাল্কি চড়ে, জমকাল ধুতি-পাঞ্জাবী পরে। গন্ধদ্রব্য মেখে। তার দলে কিছু শিক্ষিত লোকও ছিল শোনা যায়। চিঠির বয়ানই তার প্রমাণ। চিঠি লিখে আগাম সংবাদ দিয়ে সে ডাকাতি করতে যেত কিংবা টাকা চেয়ে পাঠাত। টাকা পেলে সে হামলা করত না। না পেলে সে হয়ে উঠত কালান্তক যম।

নায়েব মশাই বললেন, — এতো সাংঘাতিক ব্যাপার মল্লিকবাবু! বিশে ডাকাতের যে কথা সেই কাজ। পাঁচ হাজার টাকা যে অনেক টাকা। সবেমাত্র দুর্গোৎসব কাটল। এবার অনেক খরচপত্তর হয়েছে। তহবিল তো ফাঁকা।

চন্দ্রমোহন চিন্তাকুল স্বরে বললেন,— কত আছে?

— মেরেকেটে হাজার দুই।

— আর তিন হাজার যোগাড় হয় না?

— কিভাবে হবে? কোজাগরী পূর্ণিমার আর তো মাত্র তিন দিন বাকি। উপায় অবশ্য আছে। মুখুজ্জেবাবুদের কাছ থেকে কর্জ করা যায়।

— না। ওরা আমাদের প্রতিপক্ষ জমিদার। সেখানে মাথা হেঁট করা যায় না ...... আচ্ছা নায়েবমশাই, আমরা ডাকাতের হুকুম যদি না মানি? এ তো অন্যায়, জুলুম।

নায়েব মশাই শিউরে উঠে বললেন, —অমন কাজটি করতে যাবেন না। ধনে প্রাণে মারা পড়বেন। ওর হুকুম অমান্য করে কত জমিদার সর্বস্বান্ত হয়েছে, মারা পড়েছে।

— পুলিসকে জানালে কেমন হয়?

— সর্বনাশের ব্যবস্থা আরো পাকা হয়। পুলিস শক্ত হলে ডাকাতদের এমন রমরমা হতো? ওসব চিন্তা ছাড়ুন। দেখি টাকা যোগাড়ের কি ব্যবস্থা করা যায়।

নায়েব মশাই করিৎকর্মা লোক। আগে দায়ে-আপদে মোটা অঙ্কের টাকা সময় মতোই যোগাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু এবার আর পেরে উঠলেন না। মল্লিকবাবুর মাথায় হাত। আক্ষেপ করে বললেন, — শেষবয়সে মান-সম্ভ্রম সব গেল আমার।

বলরাম কোত্থেকে শুনেছিল জমিদারবাবু খুব বিপদে পড়েছেন। ডাকাতের চিঠি আসার খবর চেপে রাখারই চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু এসব সংবাদ শেষ পর্যন্ত চেপে রাখা যায় না। প্রকাশ পেয়ে যায়ই। কানাঘুষোয় ব্যাপারটা বলরামেরও কানে গিয়েছিল।

সে এসে বলল, — হুজুর, আমাকে দিয়ে যদি কিছু হয় বলুন।

চন্দ্রমোহন শুষ্ক মুখে বললেন, — তুমি আর কি করবে! যদিও শ'খানেক লেঠেল আমার আছে, কিন্তু তাদের দিয়ে কোন ভরসা পাচ্ছি না। বিশে ডাকাতকে সামলাবার ক্ষমতা তাদের নেই। টাকার যোগাড় থাকলে অবিশ্যি রক্ষে পাওয়া যেত। তারও কোন বন্দোবস্ত করে উঠতে পারিনি।

বলরাম একটু চুপ করে থেকে বলল, — ভাববেন না। আমি চৌধুরী জাঙালে যাব।

— টাকা না নিয়েই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। টাকা থাকলে তো যে কেউ যেতে পারত। আমি শূন্যি হাতেই যাব।

— মরবার জন্যে? খালি হাতে গেলে বিশে ডাকাত তোমাকে খুন করবে। বিশে ডাকাত সাক্ষাৎ যম, যমের মুখে তোমাকে ঠেলে দিতে পারি না।

বলরামের মুখে শিশুর হাসি ফুটে উঠল। একমাত্র শিশুই এরকম নিষ্পাপ হাসি হাসতে পারে। বলল, — ভাববেন না আপনি। আনন্দবিহারীর ইচ্ছায় কাজ সেরে ফিরে আসতে পারব। ডাকাতদের আমি ফিরিয়ে দোব, দেখবেন।

— কি ভাবে?

— তা জানি না। আমার মন বলছে আমি পারব।

চন্দ্রমোহন জানেন এ নিছক পাগলামি, একজন মানুষ এক পল্টন ডাকাতকে পরাস্ত করতে পারে না, তা সে মানুষ যতই দুঃসাহসী আর অস্ত্রনিপুণ হোক। সাধ্যমতো বলরামকে নিবৃত্ত

করার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কোন কথাই সে শুনল না। বলরামের জেদের কাছে হার মানলেন মল্লিকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, — মৃত্যু তোমাকে ডাকছে। আমি কি করে বাঁচাব?

বলরাম বলল, — যাঁর কাজে যাচ্ছি তিনিই আমাকে বাঁচাবেন হুজুর।

।। চার ।।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় চারদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রাত সবে একপ্রহর হয়েছে। কিন্তু মাঝরাতের স্তব্ধতা নেমে এসেছে চারদিকে। পথঘাট নির্জন কদাচিৎ কোন পল্লীবাসীর ঘরে আলো জ্বলছে। রাস্তার ধারে ধারে বট-পাকুড়-নিমের জটলা তার নিচে শুয়ে আছে ঘন অন্ধকার। গাছের পাতা-চোঁয়ানো আলোটুকুই এক্ষেত্রে পথিকের পথ চলার ভরসা।

অন্তত একশো বছর আগেকার নদে জেলার মেহেরপুর গ্রাম। সেখান থেকে একটি প্রশস্ত গ্রাম্য পথ চলে গেছে চৌধুরী জাঙালের দিকে। সে সময়কার একটি কুখ্যাত মাঠ এই চৌধুরী জাঙাল। ডাকাতের তীর্থক্ষেত্র এই মাঠ। এখানেই রাতের বেলা জমায়েত ঘটত বিশে ডাকাতের দলবলের।

সেই মাঠের দিকেই রাতে যাচ্ছিল লোকটি রণ-পায়ে চড়ে। মেহেরপুর থেকে দু'ক্রোশ দূরে চৌধুরী জাঙাল তার গন্তব্য। তার বাঁ কাঁধে ঝুলছে একটি দীর্ঘ ধনু, পিঠে তীর রাখার জায়গায় কয়েকটি তীর। পথের আলো-আঁধারি অগ্রাহ্য করেই সে রণ-পায়ে চড়ে এগোচ্ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ারের মতো। লোকটি বলরাম। তার দেহ এখন ইস্পাতের মতো শক্ত, মুখখানি প্রতিজ্ঞাকঠোর মহিমায় অচঞ্চল। লেশমাত্র ভয় নেই অন্তরে। বলরাম সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। কি ধাতুতে গড়া কে জানে!

দেখতে দেখতে চৌধুরী জাঙালের কিনারায় এসে পৌঁছল বলরাম। নামল রণ-পা থেকে জ্যোৎস্নার জোয়ারে মাঠ প্লাবিত। অনেক দূর পর্যন্ত চোখ চলে। মাঠের ভিতর দিয়ে একটা সড়ক চলে গেছে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। তাই দিয়েই রাহী লোকদের যাতায়াত। বহু রোমাঞ্চকর কাহিনীর পীঠস্থান এই চৌধুরী জাঙালে এই প্রহর-অতিক্রান্ত রাতে বলরামের মতো দুঃসাহসী লোক ছাড়া আর কে থাকবে! সে দাঁড়িয়ে আছে জাঙালের লাগোয়া চত্বরটায়, গাছের আড়ালে চারদিক নিঃসাড়-নিঝুম, শেয়ালের ডাক পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। কেমন একটা অলৌকিক অপার্থিব পরিবেশ।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই কানে এল পাল্কির বেহারাদের হুম্-হুম শব্দ। আসছে বাবু বিশ্বনাথ। মশালের আলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে অন্ধকারের পটভূমিতে।

পাল্কি কাছে আসতে বলরাম গুনে দেখল বেহারাসমেত জনা কুড়ি লোক মোটমাট [illegible] বাড়িতে ডাকাতি করতে বেরোয়নি বলেই বোধহয় বেশি লোক সঙ্গে নেয়নি বিশ্বনাথ।

পাল্কিটা মাঠ ছেড়ে চত্বরে ঢুকতেই বলরাম গাছতলা থেকে বেরিয়ে এল। পাল্কির গতিরোধ করে বলল, — আর এক পা-ও এগোবে না, থামো তোমরা।

এমন আশ্চর্য কথা কখনো শোনেনি বেহারারা। পাল্কি থামাতে বলছে একজন লোক। মাত্র একজন! পাগল নাকি? নাকি আড়ালে লুকিয়ে আছে অনেক লোক, তাই এর এত দুঃসাহস!

একজন বেহারা বলল, — কে তুই?

বলরাম বলল, — সে উত্তর তোমাদের সর্দারকে দেবো। তোমাকে নয়।

পাল্কির ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন এল, — এত তক্‌রার কিসের? আমরা কি ঠিক জায়গায় এসে গেছি?

— আর সামান্য একটু যেতে হবে সর্দার। একটা লোক কোত্থেকে এসে ঝামেলা করছে। পাল্কি আটকে দিয়েছে সে।

— বটে! বিশ্বনাথ সর্দারের পাল্কি আটকাবার মতো মানুষও আছে সংসারে! দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা। পাল্কি থামা।

থামল পাল্কি। নেমে এল একটি লোক। পরিপাটি পোশাক। মাথায় বাবরি চুল। চেরা সিঁথি। পায়ে জুতো পর্যন্ত আছে। বিশে ডাকাত নয়, বাবু বিশ্বনাথ দাস। কোমরের খাপ থেকে ঝুলছে দীর্ঘ তলোয়ার।

বলরামের দিকে তাকিয়ে বলল, — বিশে ডাকাতের পাল্কি থামাস, এত সাহস! কে তুই?

মেহেরপুরের মল্লিকবাবুদের দারোয়ান। — বলরাম জবাব দিল।

— তাহলে টাকা দে! চলে যাই। মিথ্যে ঝুটঝামেলা আমার পছন্দ হয় না।

— টাকা আনিনি। অতো টাকা এখন হাতে নেই মল্লিকবাবুর। তবে টাকা থাকলেও আনতাম না।

বিশ্বনাথ কর্কশ গলায় বলল, — বটে! মস্করা হচ্ছে বিশে ডাকাতের সঙ্গে:

—এটা একটা খাঁটি কথা। বিশে ডাকাত। তবে বাবু বিশ্বনাথ বলে হাঁকডাক কর কেন?

বিশ্বনাথ ক্রমশঃ অবাক হচ্ছিল। রাগ যত, বিস্ময় তার চেয়েও বেশি। তার নাম শুনে সবাই ভির্মি খায়, আর এ ব্যাটা কিনা দিব্যি সমানে জবাব দিয়ে যাচ্ছে!

বিস্ময় চেপে সে হুঙ্কার দিয়ে বলল, — তোর কি জান প্রাণের ভয় নেই? জানিস, আমি হুকুম করা মাত্র দলের লোকেরা তোকে কেটে কুঁচিয়ে মাঠে ছড়িয়ে দিতে পারে!

— তা পারে। তবে তাতে বাহাদুরিটা কিসের? একলা একলা লড়তে বলো, যে কারো সঙ্গে লড়ব। লাঠি, তলোয়ার তীর — যে কোন কিছুতে।

— বলিস কি! ওই তো তোর পুঁচকে শরীর। লাঠির এক ঘায়ে কাৎ হয়ে যাবি।

এইসময় কে একজন বলে উঠল, — সর্দার, লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ওকে শেষ করে দেবার হুকুম দাও।

বিশ্বনাথ বলল, — তা তো দেবই। তবে যাকে খুন করছি তার নামটা একটু জানতে ইচ্ছে করছে। তোর নাম কি রে?

— আমার নাম বলরাম হাড়ি

এবার বিশ্বনাথ যেন একটু চমক খেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, — ও, তুমিই সেই ? মস্তো লেঠেল আর তীরন্দাজ ? দেখ, তোমার নাম আমি শুনেছি, বুঝতেই পারছ! গুণীর মান রাখতে আমি জানি। নিজের গুণ যদি প্রমাণ করতে পার কোন ক্ষতি করব না। কেউ হাত দেবে না তোমার গায়ে। আর যদি প্রমাণ করতে না পার তাহলে আজকের রাতই তোমার শেষ রাত। রাজি ?

— রাজি। বলো কি প্রমাণ চাও ?

বিশ্বনাথ চিন্তিতভাবে এদিকে-ওদিকে তাকাল। কিভাবে লোকটার যোগ্যতার পরীক্ষা নেবে সেটাই চিন্তা করছিল। ভাগ্যক্রমে একটা সুযোগ আপনা থেকেই জুটে গেল। সেইসময় আকাশপথে উড়ে আসছিল একঝাঁক বুনো হাঁস। তাদের কিচকিচ আওয়াজে সবাই মুখ তুলে দেখল ঝাঁকটা তাদের দিকেই উড়ে আসছে। অন্তত দু'নারকেল গাছ উচ্চতা দিয়ে।

বিশ্বনাথ বলল, — ভাগ্য সহায়। পরীক্ষার উপায় পেয়ে গেছি। তীর ছুঁড়ে ওই ঝাঁকের একটাকে নামাতে হবে। যদি পারিস বুঝব এলেম আছে। বেঁচে গেলি এযাত্রা। না হলে —

কথাটা শেষ করল না বিশ্বনাথ। কিন্তু ইঙ্গিতটা সুস্পষ্ট। নিঃশব্দে ভগবানের নাম নিয়ে কাঁধ থেকে ধনু নামিয়ে সেটা শূন্যে তুলল বলরাম। আকর্ণ ছিলা টেনে লক্ষ্য স্থির করল। তখন মাথার ওপর দিয়ে হাঁসের ঝাঁকটা পার হচ্ছিল। সকলে প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। হঠাৎ একটা টঙ্কার ধ্বনি উঠল। জ্যোৎস্নার চাদর ফুঁড়ে শূন্যে উড়ে গেল একটা দীর্ঘ শর। তারপর সবার অবাক চোখের সামনে ঝপ্ করে মাটিতে এসে পড়ল একটা তীরবিদ্ধ হাঁস।

সর্দার এক মুহূর্ত আশ্চর্য হয়ে গতায়ু জীবটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটা হাত বলরামের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, — সাবাস! এমন তরান্দাজি জীবনে দেখিনি। তুমি যথার্থ গুণী লোক বলরাম। নিজের চোখে না দেখলে ভাবতুম এটা ভোজবাজি। সাহসেরও শেষ নেই। বিশ্বনাথবাবুর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতেও জীবনে এই একজনকেই প্রথম দেখলুম। আমার কথার খেলাপ হবে না। তুমি নির্ভয়ে ফিরে যাও। আমিও ফিরে যাচ্ছি। খালি হাতে এই প্রথম ফিরে যাচ্ছে বিশে ডাকাত। মানীর মান সে রাখতে জানে।

সত্যিই ফিরে গেল ডাকাত বিশ্বনাথ। চৌধুরী জাঙালের কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নায় হারিয়ে গেল তার পাল্কি। দস্যুও কত বিচিত্র হয়! বলরাম অক্ষত শরীরেই ফিরে এল মেহেরপুরে।

।। পাঁচ ।।

প্রভুর জন্যে বলরাম যা করেছিল তা ইতিহাসে লেখা থাকার বিষয়। কিন্তু বলরাম রাজা কিংবা রাজপুরুষ নয়। নিতান্ত সাধারণ মানুষ। তাকে নিয়ে কিংবদন্তি আছে, ইতিহাস নেই। তবে আঞ্চলিক বৃত্তান্তে তার এই দুঃসাহসিকতা স্থান পেয়েছে। সেখানে এও দেখি যে তার সৎসাহস পুরস্কৃত হয়নি। লাঞ্ছিত হয়েছে, অবমূল্যায়িত হয়েছে। হয়তো এর দরকার ছিল। নইলে এক সাধারণ লেঠেল-তীরন্দাজ এক মহৎ সাধুতে রূপান্তরিত হতে পারত না। আঘাতই মানুষকে জাগিয়ে তোলে, এ তো চিরন্তন সত্য।

কিছুটা আত্মপ্রসাদ নিয়ে বলরাম মেহেরপুরে ফিরেছিল। সে ভাবতেও পারেনি তার জন্যে

এক নিষ্ঠুর ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে।

ফিরতে মাঝরাত। কিছুটা দূর থেকেই একটা কোলাহল তার কানে আসছিল। গোলমালটা আসছে জমিদারবাড়ির দিক থেকেই। ডাকাত পড়ল নাকি? বিশে ডাকাত ছাড়াও তো ডাকাতের অভাব নেই। সেরকমই একদল কি লুঠপাট করছে? বলরাম নিজের গতি বাড়াল।

মন্দিরের লাগোয়া জমিটায় এত লোক কেন এমন মাঝরাত্তিরে? একটু অবাকই হল বলরাম। কিন্তু বিশেষ ভাবাভাবির সে অবকাশ পেল না। 'এই তো এসে এগছে' বলে আট-দশজন লেঠেল ছুটে এসে তাকে জাপ্টে ধরল, তারপর টেনে হিঁচড়ে ধরে নিয়ে গেল চন্দ্রমোহনের কাছে। তিনি তখন উপস্থিত জনতাকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন।

পাইক সর্দার বলল, — ব্যাটা নিজেই ধরা দিয়েছে। এখন কি করবেন করুন।

এক লহমা স্তব্ধ হয়ে বলরামের দিকে চেয়ে থেকে চন্দ্রমোহন বললেন, — স্বপ্নেও ভাবিনি তুমি শেষ পর্যন্ত এ কাজ করবে।

বলরামের বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। সে কেবল বলতে পারল, — খুলে বলুন হুজুর, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

পাইক সর্দার বলে উঠল, — ও ব্যাটা ন্যাকা সাজছে। জুতিয়ে ওর মুখ ছিঁড়ে দিন। গল্‌গল্‌ করে সব বেরিয়ে আসবে তখন।

হাত তুলে সর্দারকে থামিয়ে দিয়ে চন্দ্রমোহন বললেন, — আনন্দবিহারীর রত্নহারটা পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ধ্যাবাতির সময় পর্যন্ত বিগ্রহের গলায় ওটা ছিল, তারপর থেকেই নিখোঁজ। সবার ধারণা তুমিই ওটা সরিয়েছ।

বলরাম বলল, — আপনি তো জানেন হুজুর, মন্দিরে কখনও ঢুকি না। আর মন্দিরে তো তালা দেওয়া থাকে। আর চাবি থাকে হুজুরের কাছেই। হুজুর না থাকলে গিন্নিমার কাছে

— কিন্তু তালা তো ভাঙা যায় বলরাম। নানা দুশ্চিন্তায় মনের স্থিরতা ছিল না আজ। তুমি বেরিয়ে যাবার পর মন্দিরে যাই। দেখি তালা খোলা। অবাক হয়ে যাই। ভেতরে ঢুকে একটু খুঁটিয়ে দেখতেই চোখে পড়ল রত্নহারটা নেই। কে তালা খুলল? কে নিল রত্নহার? সত্যি করে বলো জিনিসটা তুমি সরিয়েছ কিনা।

— আমি এর কিচ্ছু জানি না হুজুর।

কে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, —ও সব জানে। ওর ভালমানুষিতে ভুলবেন না জমিদারবাবু। এটা ওর মুখোশ। বিশে ডাকাতের হাতে ও-ই জিনিসটা তুলে দিয়েছে। না হলে টাকা না নিয়ে গেল কোন্‌ সাহসে? লোকটা চালাক, তাই ফিরে এসে সাধু সাজবার চেষ্টা করছে। বিশে ডাকাত ওকে অমনি অমনি ছেড়ে দিল?

চন্দ্রমোহন বললেন, —ঠিক কথা। বিশে ডাকাত অমনি অমনি ছেড়ে দেবার লোক?

বলরাম তখন প্রকৃত ঘটনাটা খুলে বলল।

একদল লোক অবিশ্বাসের হাসি হাসল, —তুমি যে দেখছি মহাভারতের অর্জুন হে। বিশ্বাস করবেন না জমিদারবাবু। উড়ন্ত পাখিকে এভাবে তীর বেঁধে নামানো যায়?

চন্দ্রমোহন বললেন, —তা অবশ্য যায়। গৌতমবুদ্ধের আর এক নাম সিদ্ধার্থ। সেই সিদ্ধার্থের খুড়তুতো ভাই দেবদত্ত তীর বেঁধে বুনো হাঁস নামিয়েছিল। সে কাহিনী অনেকেই জানে। সে কথা থাক। কথা হচ্ছে বলরাম যদি কবুল করে রত্নহার নিয়েছে, তাহলে ব্যাপারটা চুকে যায়। কোনো শাস্তি তাকে দেব না। ও শুধু দিয়ে দিক জিনিসটা।

কিন্তু বলরামের এক উক্তি, আনন্দবিহারীর কোনো অলঙ্কার সরায়নি, এমনকি চোখে দেখেনি পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে চন্দ্রমোহন বললেন, —বলরাম, রত্নহার তুমি সরিয়েছ কি সরাওনি জানি না। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যখন উঠেছে, তখন তোমাকে আর এখানে রাখতে পারি না। বিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে, তাই কঠোর শাস্তি আমি দেবো না। এই মুহূর্তেই চলে যাও এখান থেকে। আমার জমিদারির মধ্যে কখনও যেন না দেখি তোমাকে।

বলরাম কিছু বলল না। আনন্দবিহারীর মন্দিরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন বলল, তারপর চন্দ্রমোহনকে আনত নমস্কার জানিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

খুব বেঁচে গেল ব্যাটা।—কে যেন বলল। গুঞ্জন উঠল সমস্বরে। জমিদারবাবুর বিচার তাদের মনঃপূত হয়নি।

কেবল চন্দ্রমোহন অস্ফুটে বললেন,—কাজটা বোধহয় ঠিক হল না।

এরপর বিশ বছর বলরামের কোন খোঁজখবর নেই। সে ফিরে এল ঠিক বিশ বছর পরে। তবে সাধক বলরাম হিসেবে। গোঁফদাড়ি ভর্তি মুখ, মাথায় লম্বা চুল। অঙ্গে গেরুয়া পোশাক। চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, কেবল বয়সের ছাপ পড়েছে কিছুটা।

সাধু বলরাম যে বলরাম হাড়ী, তা সহজেই চিনতে পারল অনেকে। সঙ্গে বেশ কিছু শিষ্য। বলরামদের গ্রামের কিছুদূরে নদীতীরে একটি জঙ্গলাবৃত স্থান, সেখানেই আশ্রয় নিল তারা। কিছুদিনের মধ্যেই সাধু বলরামের নাম আশপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল।

একজন চেনা লোক যদি অন্য রকম হয়ে যায়, সাধারণ পর্যায় থেকে অসাধারণ পর্যায়ে উঠে যায়, তবে তাকে নিয়ে নানা কৌতূহল লোকের মনে উঁকিঝুঁকি মারে।

যে কৌতূহলটা সবচেয়ে তীব্র আকার নেয়, তা হল এই বিশ বছর বলরাম ছিল কোথায়, এবং এইসময় সে কি করছিল? কিন্তু এই প্রশ্নে বলরাম নীরব থাকে। তার জীবনের বিশ বছরের অধ্যায়টা অজানাই রয়ে যায় লোকের কাছে।

চন্দ্রমোহনের আদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। বেঁচে থাকতে বলরামকে আর কখনও তিনি দেখেননি। তাঁর মৃত্যুর পর জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে সে। এখন চন্দ্রমোহনের পুত্র চন্দ্রচূড়ের যুগ। জমিদার হিসেবে মন্দ লোক নন, পিতার পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন। তবে পূর্ব গৌরব বজায় রাখতে পারেননি। এখন তাঁদের প্রতিপক্ষ জমিদার মুখুজ্জেবাবুদের খুব নাম ডাক, বোলবোলাও।

জমিদার শচীকান্ত মুখুজ্জের নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। মেহেরপুর বিস্তীর্ণ জনপদ। এর পশ্চিমপ্রান্তে তাঁর বাসভবন। মল্লিকবাবুদের যখন পড়তির দশা, তখন তাঁর



উঠতির। এই উঠতির মুখেই জমিদারেরা সবচেয়ে দুর্দান্ত আর বে হিসেবি হয়ে ওঠে। নিচের ঘটনাতেই তার পরিচয় মিলবে।

বলরাম সম্প্রদায় আউল-বাউল সম্প্রদায়। সাধন-ভজন-গান, এই নিয়েই তাদের দিন কাটে। জীবিকা বলতে ভিক্ষা। প্রতিদিন বলরামের চ্যালাচামুণ্ডারা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে গ্রাম-গ্রামান্তরে বেরিয়ে যায়। প্রত্যেকের ঝুলিতে যা জমে, তা আখড়ায় এসে উপুড় করে দেয়। বলরামী সম্প্রদায়ের কারো নিজস্ব বলে কিছু নেই।

সেদিন সকালেও বলরামের এক শিষ্য, নাম তার বিষ্ণুচরণ, ভিক্ষায় বেরিয়েছে। সাত বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে মুখুজ্জেবাড়ির দেউড়িতে হাজির। শচীকান্ত তখন ইয়ারবকশী নিয়ে বৈঠকখানায় আড্ডা জমিয়েছেন। বিষ্ণুচরণের হাতে একতারা, গলায় গান।

শচীকান্তর এক পারিষদ স্রেফ মজা করার জন্যেই তাকে বৈঠকখানায় ধরে নিয়ে এলো। বলল, বাবুকে গান শোনা। খুশি করতে পারলে ভালরকম বকশিশ পেয়ে যাবি।

বাবু বিশেষ কতকগুলো গানের ফরমাস করে বললেন, —এসব গান জানিস?

বিষ্ণুচরণ হাত জোড় করে বলল, —এসব গান জানি না হুজুর। আমরা ঠাকুর দেবতার গান ছাড়া অন্য গান জানি না।

শচীকান্ত বললেন, —তোরা তো বাউল-বোষ্টম দেখতে পাচ্ছি। তাই তো?

—আজ্ঞে না, আমরা বলরামী। আমাদের গুরুগোঁসাই হলেন বলরাম হাড়ী।

শচীকান্তর চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠলো। বললেন, —অ, বলরাম হাড়ী! আজকাল খুব নাম শুনছি বটে। তা সে ব্যাটা তো মল্লিকবাবুদের মন্দির থেকে গয়না চুরি করে ফেরার হয়েছিল। এখন শুনছি সে মস্তো সাধক। শেষ পর্যন্ত এক চোরডাকাতের চ্যালা হতে গেলি!

বিষ্ণুচরণের মুখের ভাব বদলে গেল। গলা চড়িয়ে বলল, —অমন কথা বলবেন না। শুনলেও পাপ হয়। আমাদের গুরু একজন মহাপুরুষ।

শচীকান্ত ব্যঙ্গতিক্ত কণ্ঠে বললেন,— হাড়ী-বাগদীর ঘরে মহাপুরুষের জন্ম!

এক আড্ডাধারী বলে উঠল,—ছোটজাতকে মাথায় তুলছে সবাই মিলে। বামুন কায়েতদের সম্মান বলতে আর কিছু রইল না। এই, তোর গুরুকে একদিন এখানে আসতে বল। বাবু তাকে দেখতে চান। অমনি একটা পেন্নামও করে যাবে বাবুকে। বাবুর জমিদারির মধ্যে থাকবে, অথচ বাবুকে সেলাম জানাবে না, এ হয় না।

বিষ্ণুচরণ দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল, —আমার গুরু কারো হুকুমের চাকর নয়। ইচ্ছে হলে হুজুর নিজেই তাকে দেখে আসুন না।

শচীকান্ত এতক্ষণ সহজ ভঙ্গিতেই কথাবার্তা বলছিলেন। এবার তাঁর জমিদারি রক্তে আগুন ধরে গেল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন,-এত বড় কথা। জমিদার শচীকান্ত মুখুজ্জে তোর গুরুকে দর্শন করতে যাবে! এই, ডাক তো তোমরা ঝণ্টু ওস্তাদকে। সে একে একটু সমঝে দিক। তোমরাই বলো- এই লোকটা আমাকে যা বলল তাতে আমার অপমান হয় কিনা!

স্তাবকরা হৈ-হৈ করে উঠল, হয় বৈকি। একশোবার হয়। জমিদারবাবু, ওকে একটু শিক্ষা

দিয়ে দিন। বলরাম যদি মহাপুরুষই হয়, ওকে বাঁচাক।

শচীকান্তর হুকুম তামিল করতে দেরি করল না ঝণ্টু ওস্তাদ। তার হাত থেকে যখন রেহাই পেল, তখন বিষ্ণুচরণের কাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, সারা শরীর রক্তাক্ত।

সেই অবস্থাতেই কোন রকমে টলতে টলতে আখড়ায় পৌঁছে সে বলরামের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, —আমার কি অবস্থা করেছে দেখুন।

—কে করল এ অবস্থা?

— মেহেরপুরের জমিদার শচীকান্ত মুখুজ্জে।

—তোর অপরাধ?

—কোন অপরাধ নেই। দোষের মধ্যে বলেছিলুম -আমাদের গুরু মহাপুরুষ।

বলরামের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য দপ্‌দপ্ করে উঠল। এরপর শান্ত হয়ে এল। ধীর গলায় বলল, বিষ্টু, এর শাস্তি আমি দিতে পারতুম কিন্তু দেবতার নামে শপথ করেছি জীবনে আর তীর লাঠি তলোয়ার ধরব না। কাঁদিস না ভাই, ধৈর্য ধরতে শেখ। আমাদের পথ হিংসা নয় ভালোবাসা। আর শোন, আমি মহাপুরুষ নই, সাধারণ মানুষ। পাপীর শাস্তি আমার হাসতে নেই। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত জমিদার নিজেই একদিন করবে। এই হল আমার ধর্ম, আমার শিক্ষা।

শুনতে আশ্চর্য লাগবে যে জমিদার শচীকান্ত মুখুজ্জে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বলরামের আখড়া দর্শনে গিয়েছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমাও চেয়েছিলেন। এই ঘটনাকে তাঁর নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্তও বলা যেতে পারে।

বলরাম হাড়ীর জীবন কথায় লৌকিক-অলৌকিক নানা কাহিনীর সমাবেশ ঘটেছে। সেগুলির কিছুটা বাস্তব, কিছুটা অতিশয়োক্তি, কিছুটা বানানো। কিংবদন্তি পুরুষদের নিয়ে এটা ঘটেই থাকে। কিন্তু একজন অন্ত্যজের ঘরে জন্মানো সাধারণ, নিরক্ষর মানুষ কিভাবে হৃদয় ঐশ্বর্যে ও সাধনার জোরে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে, বলরাম হাড়ীর জীবন তারই দৃষ্টান্ত।

পরিতোষবাবু এবং একটি জেম্বিয়া

আজ নিয়ে ঠিক তিনদিন ব্যাপারটা ঘটল।

শনিবারে ঘটনাটার শুরু। সেদিন অবশ্য তেমন সুনিশ্চিত হতে পারেননি পরিতোষবাবু। তাঁরই মতো রাহী লোক-টোক কেউ হবে ভেবেছিলেন। কিন্তু একজন মানুষ পিছু নিলে কেমন করে যেন বুঝে ফেলা যায়। পরিতোষবাবুর বয়স ছাপান্ন, আর দু'বছর পরে চাকরি থেকে তাঁর বরাবরের ছুটি হয়ে যাবে। যে কোন ছা-পোষা মাঝবয়েসী বাঙালি ভদ্রলোকের মতোই তিনি একটু আয়েসী ভঙ্গিতে হাঁটেন। আর একজন লোকও একই রাস্তা ধরে, একই সময়ে, তাঁর কাছ থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে একই রকম আয়েসী ভঙ্গিতে পর পর তিনদিন হাঁটবে—এটা কাকতালীয় ব্যাপার বলে মনে করার মতো যথেষ্ট জোর পাননি পরিতোষবাবু। মোটামুটি হিসেবে লোকটা তাঁর কাছ থেকে আধ ফার্লংটাক দূরে থাকে। গেল তিনদিনে এর বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। পরিতোষবাবু লক্ষ্য করে দেখেছেন তিনি দাঁড়ালে লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ে। তিনি সচল হলে লোকটাও চলতে শুরু করে।

লোকটার বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। থ্যাবড়া নাক, ভুরু নেই বললেই চলে। গায়ের রঙ তামাটে। পরণে বুশ শার্ট আর প্যান্ট। হঠাৎ নেপালী বলে সন্দেহ হয়। বাঙলা মুলুকে অনেক দিন ধরে থাকলে যেমনটি হয়ে যায় এ-লোকটার চালচলনও সেই ধরণের। তবে ও-মুখ দেখলে ভুলতে অনেক দেরি লাগে। বিশেষ করে ওর কপালের ডানদিকে একটা কাটা দাগ আছে, সেজন্যে ওকে মনে রাখা সহজ।

প্রথম দিনের ব্যাপারটা পরিষ্কার মনে আছে পরিতোষবাবুর। বাস থেকে নেমে মোড়ের পানবিড়ির দোকানের সামনে রোজই কিছুটা সময় যায় তাঁর। পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। মিহি বাংলা পাতার সঙ্গে মোহিনী জর্দার স্বাদ নিতে নিতে ভাবছিলেন একটা সিগারেট ধরাবেন

কিনা, হঠাৎ মনে হল কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে একটা নেপালী ধরণের লোক তাঁকেই যেন লক্ষ্য করছে। দোকানের প্রকান্ড আরশিটায় রাস্তার অপরদিকের লাইটপোস্টটায় ছায়া পড়েছে, মানুষটা তারই নিচে দাঁড়িয়ে। নজর তারই ওপর স্থির। ব্যাপারটা তার চোখে ধরা পড়েছে অনুমান করেই যেন লোকটা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সেই অবকাশে ওকে আরো ভালো করে দেখে নিয়েছিলেন পরিতোষবাবু। ওর হাইট, ডোরা-কাটা নীলরঙের শার্টটা, ঝলঝলে খাকি ট্রাউজার্সটাও। বাসার কাছাকাছি পৌঁছে যে কোন কারণেই হোক একবারটি দাঁড়িয়ে পড়ে পিছনবাগে তাকিয়ে বেশ খানিকটা তফাতে দেখতে পেয়েছিলেন ওকে। ততক্ষণে লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। যে হাউসিং এস্টেটে তিনি থাকেন সপরিবারে সেখানে ওরকম নেপালী চেহারার কাউকে চেনেন না, যদিও ওখানকার সব লোকই মোটামুটি তাঁর মুখচেনা। অবশ্য শনিবার তাঁর মনে হয়নি যে লোকটা বিশেষ ভাবে তাঁকেই অনুসরণ করছে। কিংবা মনে হলেও হাত নেড়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

পরের দিনটা রবিবার, অফিস ছিল না। সোমবার মোড় থেকে হাঁটতে হাঁটতে কে জানে কেন মনে পড়ে গিয়েছিল লোকটার কথা। আর আশ্চর্য, পিছন দিকে চেয়ে পেটের কাছটা কেমন খালি-খালি লাগার অনুভূতি টের পেয়েছিলেন। শ'খানেক মিটার দূরে সেই লোকটা। দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা নিচু করে কি যেন খোঁজায় ব্যস্ত! এটা কি গল্পের কাক আর তালের আকস্মিক যোগাযোগের মতো!

বাসরাস্তার মোড় থেকে পরিতোষ বাবুদের হাউসিং এস্টেট আধ কিলোমিটারের মতো দূর। এদিকটায় সবে শহর বাড়তে শুরু করেছে। একপাশে সারি সারি বাড়ি উঠেছে। অন্যদিকে এখনও জলা মাঠ ঝোপঝোপ। একটা পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে বটে তবে আলোর ব্যবস্থা তেমন নেই। লাইটপোস্টগুলোর বেশির ভাগই বেকার—একটা জ্বলে তো দুটো জ্বলে না। ফলে গোটা রাস্তাটাই ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকারের দখলে। লোক চলাচলও অল্প। রাত সাড়ে-আটটা নটার ভেতরেই নির্জন হয়ে আসে। আশপাশ দিয়ে যে গোণাগুণতি ক'টা লোক সাইকেলে কিংবা হেঁটে যায় তাদের মুখ অনেকসময় নজরেই আসে না। আগে পরিতোষবাবুরা খাস শহরের মধ্যেই থাকতেন, বছর তিন হল উঠে এসেছেন। এতদিনেও এদিকটায় তাঁর তেমন সড়গড় হয়ে ওঠেনি। এসব শহরতলী এলাকা নিয়ে চিরকালই ভয়তরাসের গল্প থাকে, থাকে অনেক বদনাম। ফলে কেউ যদি সত্যিসত্যিই তাঁর পিছু নেয় তাহলে ভয় পাবারই কথা।

দ্বিতীয় দিনেই কেমন একটা অস্বস্তি পেয়ে বসে পরিতোষবাবুকে। সত্যিসত্যিই কি কেউ তাঁকে ফলো করছে? নাকি সবটাই মনের ভুল? কিন্তু তিনি, শ্রী পরিতোষ খাসনবীশ, নেহাৎ নিরামিষ একটা চাকরি করে সংসার চালান, পাড়া বা অফিসে কোন দুর্নাম নেই, এমনকি পাড়ার দুর্গা কালী সন্তোষীমার পুজোতে বরাবর চাঁদা দিয়ে আসছেন, যাকে বলে নিপাট ভদ্রলোক —তাঁর পিছু নিতে যাবে কে এবং কি কারণে? মনের সংশয় মনেই চেপে রেখেছিলেন। বাড়িতেও এ নিয়ে আলোচনা করেননি।

আজ মঙ্গলবার। অফিস গিয়েছেন যথারীতি এবং সেখানে সারাদিন কিছু মনে পড়েনি। ছুটির পর থেকে বেরোবার মুখেই সোমবারের রাতের অভিজ্ঞতাটা ঝিলিক দিয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। আজো যদি দেখেন যে একটা লোক ঠিক একশো মিটার পিছনে হাঁটছে—

তাহলে অবশ্যই ভাবতে বাধ্য হবেন যে নির্জন রাস্তায় লোকটার হাঁটাটা কাকতালীয় নয়, উদ্দেশ্যমূলক।

ভাবতে বাধ্য হবেন নয়, বাধ্য হলেন পরিতোষবাবু। আজো সেই চলা-থামার লুকোচুরি খেলা ঘটল। আর আগে কোনদিন অভিজ্ঞতায় আসেনি এরকম কয়েকটা অনুভূতি পর পর স্পর্শ করে গেল তাঁকে। প্রথমে তিনি প্রচন্ডরকম ঘাবড়ে গেলেন, শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে শিরশির্ করে কি যেন নেমে গেল। তারপর পা দুটো দৌড় দেবার একটা প্রবল উদ্যম দেখিয়েই রাস্তায় যেন সেঁটে গেল একেবারে। এরপর তিনি সাংঘাতিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। শেষের ব্যাপারটা অনুভূতি নয়, প্রতিক্রিয়া। তাঁর ডান হাতটা কোন্ এক দুর্বোধ্য প্রেরণায় মুষ্টিবদ্ধ এবং কঠিন হয়ে উঠল।

পরিতোষবাবু সামনে তাকালেন, পিছনে তাকালেন। ওই একটা লোক ছাড়া কোনোদিকে কেউ নেই। আবছা অন্ধকার এবং ফাঁকা রাস্তা জুড়ে একজনই মাত্র রয়েছে। এরপর পরিতোষবাবু হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করলেন এবং বাসা পর্যন্ত একবারও পিছন দিকে তাকালেন না। শুধু বাসায় ঢোকার আগে ঘাড় বাঁকিয়ে রাস্তাটা দেখে নিলেন। অনেকটা দুরে লাইটপোস্টের নিচে একটা আবছা মনুষ্যমূর্তি তাঁর চোখে ধরা পড়ল। এবার এক নাগাড়ে তিন তলা পর্যন্ত উঠতে বোধহয় একবারও দম নিলেন না। ভদ্রলোকের ঘাম-স্নান-বিধস্ত চেহারা দেখে ওঁর স্ত্রী বললেন, 'তুমি কিজগিং করতে করতে এলে নাকি? হাঁপাচ্ছ কেন? কি ব্যাপার?'

পরিতোষবাবু ফ্যানের সুইচ অন করে দিয়ে আর রেগুলেটারটা পাঁচ পয়েন্ট তুলে দিয়ে বললেন, 'জানো, একটা লোক আমাকে ফলো করছিল!'

পরিতোষবাবুর স্ত্রী আকাশ থেকে পড়লেন, 'ফলো! তোমাকে? কে সে?'

'তা কি করে জানবো? একটা লোক — আর কিছু জানি না।'

ভদ্রমহিলা ফিক করে হেসে ফেললেন, 'তোমার মাথার ঠিক নেই। তা কোথায় সে?'

'আমার সঙ্গে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তেতলার ব্যালকনিটা রাস্তার দিকেই। সেদিকের দরজা খুলে স্ত্রীকে বারান্দায় এনে পরিতোষবাবু আঙুল প্রসারিত করলেন, 'ওই লাইপোস্টার নিচে দাঁড়িয়েছিল।'

'কই, আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'দু'মিনিট আগেও ছিল, চলে গেছে।'

তোমার বোধহয় হজম টজম ভালো হচ্ছে না। কাল বাজারে গিয়ে একটা ডাব-টাব কিনে খেও। আর সময় করে চোখের ডাক্তারের কাছেও যেও একবার।'

পরিতোষবাবু সেদিন ঘুমের মধ্যে একরাশ ভীতিকর স্বপ্ন দেখলেন।

স্মিথ অ্যান্ড শেফার্স কোম্পানীতে সাতাশ বছর ধরে চাকরি করছেন পরিতোষ খাসনবীশ। একশো পঁচাত্তর টাকায় ঢুকে এখন বেড়ে বেড়ে হাজার আড়াই দাঁড়িয়েছে। ওভারটাইম থাকাতে কিছু বাড়তি আয়েরও ব্যবস্থা রয়েছে। ছিমছাম সংসার। দুটি মাত্র সন্তান— অবনী আর নবনী। বাড়ি করতে পারেননি, কসবাগান হাউসিং এস্টেটে তিন কামরার ফ্ল্যাট। আগে ভাড়া বাড়িতে ছিলেন অন্য জায়গায়। তাঁর সহকর্মীরা কেউ কেউ বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, তিনি তেমন করিৎকর্মা লোক নন বলে পারেননি। এজন্যে তাঁর কোন মনস্তাপ নেই, স্বল্পতুষ্ট মানুষ। দুঃখ একটাই— অফিসে যে আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকেছিলেন সেটা আজকাল আর পান না। তবে সমবয়সী দু'একজন আছে যাদের মেজাজ-মর্জি অনেকটা তাঁরই মতো। তাদের সঙ্গে পরিতোষবাবুর সম্পর্কটাও ভালো। এরকম একজন হলেন সুধীর চট্টরাজ। এই মানুষটির সঙ্গে তাঁর সুখদুঃখের অনেক কথাই হয় যা বাড়িতে পর্যন্ত তিনি বলেন না। পরিতোষবাবু স্থির করেই রেখেছিলেন গত তিনদিনের 'ফলো' করার ব্যাপারটা সুধীরবাবুকে বলবেন।

বুধবার টিফিনের সময় ভদ্রলোককে ডেকে বললেন, 'ওহে সুধীর, চলো একটু বাইরে ঘুরে আসি।' তিন বছরের জুনিয়ার সুধীরবাবুকে তিনি 'তুমি' বলেই কথাবার্তা বলেন।

'বাইরে কেন, ক্যান্টিনে চলুন না।' সুধীর চট্টরাজ বললেন।

'তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। সিক্রেট ব্যাপার। 'রয়াল'-এ বসে দু'কাপ চা খেতে খেতে বলা যাবে। ওদের কাটলেটটার প্রিপারেশন চমৎকার। তাও না হয় দু'খানা নেওয়া যাবে।'

সুধীরবাবু অবাক হলেও মুখে কিছু বললেন না। পরিতোষবাবুকে তিনি মিতব্যয়ী মানুষ বলেই জানেন, সোজা কথায় কৃপণ। তাঁর এহেন ব্যয়বাহুল্য আশ্চর্যের ব্যাপার। ভদ্রলোককে কি রকম অস্থির- অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। চেহারাটাও শুকনো-শুকনো। যাই হোক, 'রয়াল' রেস্টুরেন্টে এসে কোণের সীট বেছে নিয়ে বসলেন উভয়ে। পরিতোষবাবু চা আর কাটলেটের অর্ডার দেবার পর সুধীরবাবু বললেন, 'বলুন দাদা, আপনার সিক্রেট ব্যাপারটা কি।'

পরিতোষবাবু শনি সোম আর মঙ্গলবারের ঘটনা সবিস্তারে খুলে বলে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কি মনে হচ্ছে বলো। অ্যাম্ আই রঙ্?'

পরিতোষবাবুর মুখে বাংলা ভাষাটাই কেমন জড়ানো, ইংরেজী পারতপক্ষে উচ্চারণই করেন না। উনি ভ্রান্ত কিনা ইংরেজীতে জিগ্যেস করায় বোঝা গেল ভদ্রলোক এখন খুবই টেনশনে আছেন এবং ঘটনাটা রীতিমতো সীরিয়াসলি নিয়েছেন। সুধীরবাবুর চোখ দেখেও মনে হয় উনি বেশ কৌতূহলী আর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'আপনার ভুল হয়নি। কেউ আপনাকে চেজ করছে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আপনাকে খুব অপছন্দ করে কিংবা আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত এমন কারো নাম মনে পড়ছে?'

'আমার সৌভাগ্য? সাধারণ একটা ফ্লাট কিনেছি, এটাকে যদি সৌভাগ্য বলো। অবশ্য

আমার স্ত্রী ব্যাপারটাকে দুর্ভাগ্য বলেই মনে করেন। ওঁর শখ ছিল বাড়ির, ফ্ল্যাটের নয়।'

'লটারির টিকিট কেনার অভ্যেস রয়েছে বোধকরি?'

সুধীর চট্টরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে নিলেন পরিতোষবাবু, 'পঞ্চান্ন সাল থেকে কিনে আসছি। কিস্যু হয়নি। এভাবে যাদের হয় আমি তাদের দলে নই। এবার ভাবছি রেস-টেস খেলে দেখব।'

'কোন পরধন পাবার সম্ভাবনা রয়েছে পরিতোষদা? ধরুন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারা গেলেন, তাঁর আপনজন কেউ নেই, সেক্ষেত্রে—'

'রক্ষে করো ভাই। অতোটা ভাগ্যবান আমি নই।'

'আচ্ছা, মনে করার চেষ্টা করে দেখুন তো রিসেন্টলি কোন দামী জিনিস-টিনিস কিনেছেন কিনা।'

'ফ্ল্যাট কিনতেই ফতুর, তার ওপর দামী জিনিস! গয়নাগাটি বলতে চাইছ? সোনাদানার দোকানের পাশ দিয়েই হাঁটিনি বহুকাল হল।'

সুধীর গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে বললেন, 'ভেবে দেখুন না ভাল করে। অনেক সময় খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথাও ভুলে যায় মানুষ।'

পরিতোষবাবু চা খান বটে, তবে যাকে বলে চা-রসিক তা নন। কিন্তু কি আশ্চর্য, পর পর দু'কাপ ধোঁয়া-ওঠা চা খেয়ে ফেললেন তিনি। চার্মস তাঁর ব্রান্ড, অথচ সুধীরবাবুকে অবাক করে দিয়ে তাঁর প্যাকেট থেকে একটা চার মিনার নিয়ে দু'টানে সেটার অর্ধেক শেষ করে ফেললেন। তারপর বললেন, 'চার মিনার নাকি কড়া সিগারেট! তেমন কড়া তো লাগছে না!'

সুধীরবাবু মুচকি হাসলেন, 'চার মিনার ঠিকই আছে, শুধু আপনার মেজাজটাই ঠিক নেই। কিন্তু যা বলছিলুম। ব্যাপারটা কি জানেন, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। সব ব্যাপারেই একটা মোডাস অপারেন্ডি থাকে। আপনার মতো নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হঠাৎ কারো নজরে পড়ার কারণ কি হতে পারে? ভাবুন — ভেবে দেখুন। এমন কোন ঘটনা হয়তো আছে যা আপনার নজর এড়িয়ে যাচ্ছে।'

'সুধীর, কি যেন কথাটা বললে! মোডাস — মোডাস—'

'মোডাস অপারেন্ডি। মানে কোন ঘটনার পিছনে মোটিভেশন।'

পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ না খেলেও পরিতোষবাবু বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলেন, 'আজ কাল খুব গোয়েন্দা উপন্যাস পড়ছ বুঝি সুধীর? তোমার কথাগুলো ঠিক গোয়েন্দাদের মতো। আমার বড়ো ছেলেটা ওসব বই খুব পড়ে। আমিও দু'একখানা উল্টে পাল্টে দেখেছি।'

সুধীর চট্টরাজ হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, 'আপনার বড়ো ছেলে! কতো বয়স?'

'তেইশ - চব্বিশ হবে।'

'লেখাপড়া করছে, এ্যাঁ! স্বাস্থ্য টাস্থ্য ভালো?'

'গ্রাজুয়েট। স্বাস্থ্য হাজারে এক। হাইট পাঁচ দশ। ক্যারাটে শিখছে জাপান - ফেরৎ এক

ব্ল্যাকবেল্টধারীর কাছে।'

'তাছাড়া থ্রিলার পড়তে ভালবাসে। তার মানে অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসে। বাঃ, চৌকশ ছেলে! ব্যাপারটা ওকে জানানো উচিত। নাকি জানিয়েছেন ইতিমধ্যে?'

'না, জানাইনি। হেসে উড়িয়ে দেবে না তো?'

'দেবে না বলেই মনে হয়। বলেই দেখুন না। ওকে বললে কাজ হবে।'

'বেশ, বলব।'

টিফিনের সময় ফুরিয়ে এসেছিল। পনেরো টাকার বিল অনায়াসে মিটিয়ে সুধীর চট্টরাজকে বেশ অবাক করে দিলেন পরিতোষবাবু। এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। সুধীর ঠিকই বলেছে। তাঁর বড়ো ছেলে নির্ভর করারই মতো ছেলে।

।। ৩ ।।

ময়দানের একটা নির্জন কোণে বসেছিলেন পরিতোষবাবু। সাবেকী রেওয়াজ অনুযায়ী তিনি ময়দানের বদলে গড়ের মাঠ শব্দটাই বেশী পছন্দ করেন। জায়গাটা আলোর রাজ্য থেকে কিছুটা দূরে, আবার অন্ধকারও তেমন প্রবল নয়। বেশ একটা আলো-আধাঁরের খেলা আছে জায়গাটায়। আজ পরিতোষবাবুর জীবনের বিশেষ দিন। না, রোজকের অভ্যাসমতো আজ অফিস-ফেরতা সরাসরি বাড়ি যাননি। আজও যদি 'অ্যাটাক' হয়—মানে 'ফলো' করার ব্যাপারটাকেই 'অ্যাটাক' ভাবছেন পরিতোষবাবু এবং শব্দটা বেশ পছন্দসই লাগছে তাঁর—তাহলে সেটা হার্ট অ্যাটাকের মতোই বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে উঠবে। ফলে, হাওয়া খাবার লোভে নয়, তাঁর জীবনে হঠাৎ—আবির্ভূত সমস্যাটার নানা দিক গুছিয়ে ভাববার জন্যেই গড়ের মাঠে এসেছেন তিনি। পরিতোষবাবুর বিশ্বাস গড়ের মাঠ আর আগের মতো না থাকলেও এটাই এখনও নিজের মনে চিন্তা করবার সেরা জায়গা। ভালোরকমই হাওয়া দিচ্ছিল, তবু দর দর করে ঘামছিলেন পরিতোষবাবু। তারই মধ্যে নিজের ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি।

অনুসরণকারী কি কি কারণে তাঁর পিছু লাগতে পারে? নিশ্চয়ই তাঁর বাড়ি চেনার জন্যে নয়। বাড়িটা তো প্রথম দিনই ওর চেনা হয়ে গিয়েছে। বাড়ি চিনে লাভই বা কি? সেখানে তো টাকাকড়ি গয়না-টয়না পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। দরকারের মতো সামান্য কিছু ছাড়া ওসব আজকাল লোক ব্যাঙ্কে রাখে। সোনাদানা টাকাকড়ি আছেই বা কতটুকু তাঁর? না, এ সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যেতে পারে।

এমনও হতে পারে কেউ তাঁকে ভয় পাইয়ে দিতে চায়। নিছক তামাসা করবার জন্যে আর কি! কিন্তু এই 'মোডাস অপারেন্ডি'-টা জোরালো মনে হচ্ছে না আদৌ। তাঁকে দিয়ে কৌতুকের খেলায় মেতে ওঠবার লোকের সময়ই বা কোথায় আর লাভই বা কি? 'কারণ ছাড়া কার্য হয় না' — সুধীর চট্টরাজ তো বলেইছে।

ডিটেকটিভদের মতো গুটি চার পয়েন্ট চিন্তা করে এবং সেগুলো তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন পরিতোষবাবু, 'ধেত্তেরি, এসব আমার কম্মো নয়।' খুবই

হতাশ হয়ে এদিক - ওদিক তাকালেন। অনেক দূরে পশ্চিম কোণে একটা হাই রাইজের প্রায় চুড়োর কাছাকাছি একটা নিওন- সাইন জ্বলছে নিভছে। একটা চা-কোম্পানীর বিজ্ঞাপন। সেদিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল পরিতোষবাবুর।

গেল শীতেই তো — মাসটা বুঝি অক্টোবর হবে— নেপাল গিয়েছিলেন পরিতোষবাবু। না, সপরিবারে নয়, একা। তাঁর জানাশোনা একটি ছোকরা, তাঁর বড়ো ছেলে অবনীরই বন্ধু, চাকরি - টাকরি না পেয়ে ট্যুরিজমের ব্যবসা ফেঁদেছে। নাম দিয়েছে টিউলিপ ট্রাভেলস। তো সে এসে বলল 'এবার তারা নেপাল যাচ্ছে, বাসের কয়েকটা সীট তখনও খালি, পরিতোষ কাকাবাবু যদি যান সে উপকৃত হয়। পরিতোষবাবু বরাবর ঘরকুনো লোক, রবি ঠাকুর যাঁদের সম্পর্কে 'উদ্ভিজ্জ - স্বভাবের মানুষ'কথাটা ব্যবহার করেছেন তিনি সেই ধরনের। স্মিথ অ্যান্ড শেফার্স'-এ চাকরি পেয়েই অফিসের সহকর্মীদের তাড়ায় একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন, সে সেই চৌষট্টি - পঁয়ষট্টি সালের কথা। তার তের বছর বাদে গৃহিণীর তাড়নায় একবার গিয়েছিলেন বেনারসে। সাকুল্যে এই তাঁর দেশভ্রমণ! গুচ্ছের পয়সা খরচ করে গুষ্টিশুদ্ধ নেপাল যাবার লোক তিনি বটে! কিন্তু বাড়ির লোকের কথাতেই শেষপর্যন্ত নেপাল যাবার ব্যাপারটা ঘটেছিল। 'তুমি যাকে বলে একেবারে গেছোবাবা হয়ে যাচ্ছ'— স্ত্রীর এই কথায় প্রায় অভিমান করেই নেপাল যেতে মনস্থ করেন পরিতোষবাবু।

বলতে কি হাওড়া থেকে শুরু করে নেপাল পৌছানো পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটাই যাচ্ছেতাই লেগেছিল তাঁর। হৈ-হট্টগোল, ঘুমনোর কষ্ট, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে — বাপস্, মানুষ এভাবে কি করে যে বেড়িয়ে আনন্দ পায়! আর প্রকৃতি - ট্রকৃতির বাতিক কোনদিনই তাঁর ছিল না। বিরক্তির একশেষ।

ভালো লাগার মধ্যে পশুপতিনাথের মন্দির দর্শন। দলের লোকেরা বেরিয়ে যেত নানা দিকে। কেউ গেল পোখরা বেড়াতে, কেউবা রাজবাড়ি দেখতে। তিনি দলের সঙ্গে না বেরিয়ে রোজ মন্দির দেখতে যেতেন। সেদিনও গুটি-গুটি হাঁটতে হাঁটতে পশুপতিনাথ দর্শনে বেরিয়েছেন সময়টা সন্ধের কাছাকাছি। মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে আসছেন, হঠাৎ কোত্থেকে এক মাঝবয়েসী নেপালী এসে হাজির। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'ভালো জিনিস আছে, নেবেন বাবুজী?' লোকটা অবশ্য হিন্দীতে বলল কথাগুলো।

পরিতোষবাবু অবশ্য জানেন যে নেপাল এসে ট্যুরিস্টরা অনেক জিনিস-টিনিস কেনে। জিনিসপত্র নাকি ভারি সস্তা এখানে। অবশ্য ঠকেও অনেকে। জিততে বা হারতে কোনটাই চান না পরিতোষবাবু। সস্তা পেলেই একরাশ অদরকারী জিনিসের ওপর হামলে পড়তে হবে তার মানে কি আছে? এসব ভাবতে ভাবতে তিনি একটা নিরালা রাস্তায় এসে পড়েছেন। নেপালীটা তখনও তাঁর সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। তাঁর ইতস্তত: ভাব দেখে লোকটি বলল, বাঙালীবাবুরা নেপালে এলেই কিছু না কিছু জিনিস কেনে। আপনিও বাঙালি মালুম হচ্ছে।

ফোল্ডিং ছাতা, ট্রানজিস্টার, ঘড়ি-এসব না, আমার কাছে ভালো জিনিস আছে, সে আপনি কোথাও পাবেন না।'

বাঙালী সেন্টিমেন্টাল জাত। পরিতোষবাবুও ব্যতিক্রম নন। নেপালে আসবেন অথচ কিছু কিনবেন না— এ তো বাঙালীর বদনাম। হঠাৎ তিনি বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। তবে বাইরে অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে বললেন, 'কই, দেখি তোমার জিনিস।' মনে মনে ভাবলেন বাড়ির কাজে লাগবে এমন জিনিস হলে মন্দ'ই বা কি।

লোকটি তার ঝোলা থেকে যে জিনিসটা বের করে আনল তা দেখে রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন পরিতোষবাবু। চামড়ার খাপে মোড়া মস্তো একখানা ছোরা! ছোরাটা বের করতে তিনি আরো তাজ্জব।

প্রায় ন'ইঞ্চি ফলা। প্রাচীন আমলের রোমক যোদ্ধাদের তরবারির মতো বাঁকানো। ইস্পাতের তৈরী নয় হাতলটা, যেন সোনা দিয়ে তৈরী। অন্ধকার এখনও ঘনিয়ে আসেনি। গোধূলিবেলা। তার আবছায়াতে পরিতোষবাবু মনে হল— ছোরা নয়, বিচিত্র একটা অলঙ্কার তাঁর চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। পরিতোষবাবু বিস্মিত, আবার ভীতও। ওটা ধারালো হতেই পারে। ওটা দিয়ে যদি —

লোকটা বুঝি ওঁর মনের কথা টের পেল। অল্প হেসে বলল, 'ভয় পাবেন না বাবুজী। আমার খারাপ মতলব নেই। নিতে চান তো নিয়ে ফেলুন।'

'ওটা কি কুকরি? তোমরা যা ব্যবহার করো?'

'না, কুকরি নয়। এদেশের জিনিসই নয় এটা। এদেশে কেউ এরকম ছোরা ব্যবহার করে না। বাইরের দেশ থেকে এসেছে। আমার এক দোস্ত এটা দিয়েছিল। সে বাইরে ঘোরে। বলেছিল এ-জিনিসের বহুত দাম। হাতছাড়া না করতে বলে দিয়েছিল। তা আমি গরীব লোক, টাকাকড়ির দরকার পড়েছে। তাই ছেড়ে দিতে চাইছি।'

লোকটিকে নিরীহ আর সরল বলেই মনে হচ্ছিল পরিতোষবাবুর। জিগ্যেস করলেন, 'কতো দাম চাইছ?'

'শ' চারেক টাকা দেবেন'

পরিতোষবাবু প্রায় ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠেছিলেন, 'একটা সামান্য ছোরার দাম চারশো টাকা!'

'সামান্য জিনিস নয় বাবু। এতে সোনা আছে। হাতলটা সোনার, দেখতে পাচ্ছেন না!'

'সোনা! সোনা, না গিল্টিকরা!'

'আলবৎ সোনা। আমার দোস্ত ঝুটা বাত্ বলার আদমি না। ওই অস্তরটার দাম অনেক অনেক টাকা।'

'তাহলে আর কাউকে বিক্রী করতে চাইছ না কেন? বেশী দাম পেতে।'

'পুলিশের ঝামেলার ভয় আছে বাবু। জওয়ান লেড়কাদের কাছে বিক্রী করতে গেলে

মুশকিল হয়ে যেতে পারে। গরীব লোক, ঘানি টেনে মরব শেষকালে? আপনাকে সাচ্চা আদমি মনে হচ্ছে, তাই আপনাকে বিক্রী করতে চাইছি। দাম কম হোক— ঝামেলা না হয়। কিন্তু আপনি নেবেন তো নিন, কেউ না এসে পড়ে।'

নিরীহ মানুষ পেয়ে অনেকে অনেকভাবেই তাঁকে ঠকিয়েছে, আর একবার না হয় ঠকবেন— এই ভেবে ছোরাটা কিনেই ফেললেন পরিতোষবাবু। টাকা বাড়তি নিয়েই বেরিয়েছিলেন এবং টাকা তাঁর সঙ্গেই ছিল। তবে করকরে চারখানা একশো টাকার নোট বিসর্জন দিয়ে তাঁর যে একেবারে মনস্তাপ হল না এমন বলা যায় না। 'সবই পশুপতিনাথের ইচ্ছে' বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

বাসায় এসে সদ্য-অর্জিত বস্তুটিকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ পেয়ে ভালোই লাগল পরিতোষবাবুর। তখনও পোখরা থেকে যারা সাইট-সীয়িং-এ গেয়েছিল তারা ফিরে আসেনি। ফলে জিনিসটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখার সুযোগ পেলেন। তাঁর মতো আনাড়ী লোকও স্বীকার করতে বাধ্য হল যে জিনিসটা অদ্ভুত সুন্দর। তাঁর এ-যাবৎ-দেখা ছুরি-ছোরা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের। হাতলটা গিল্টি-করা, নাকি সোনা আছে ওতে,— এ সিদ্ধান্তে অবশ্য পৌঁছতে পারলেন না। ফলার মাঝখানটায় কি একটা জন্তুর এনগ্রেভিং। কি জন্তু? না, সনাক্ত করতে পারলেন না পরিতোষবাবু। হাতলটা কাঠ বা হাতির দাঁত— পরিতোষবাবুর অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে এরকম কোন বস্তু দিয়ে তৈরী নয়। হাতলে সেট করা হয়েছে দুটো ঝকঝকে পাথর। একটা সাদা, অন্যটা বেদানার দানার মতো স্বচ্ছ লাল। এগুলো কি দামী? নাকি দার্জিলিংয়ের ভুটিয়ারা যেরকম রঙীন পাথর বিক্রী করে সেই 'দার্জিলিং স্টোন'—জাতীয় কিছু?

নেপাল সফরের সঙ্গীদের কাউকে ছোরাটা দেখাননি পরিতোষবাবু। চারশো টাকা গচ্চা তো গেছেই— মিছেমিছি সকলের তামাশার পাত্র হয়ে বাড়তি কষ্ট টেনে আনতে যান কোন্ দুঃখে? বাড়িতে ফিরেও কাউকে দেখালেন না জিনিসটা। বাড়ির সবাই তাঁর স্বভাবের কথা জানে বলে কেউ জানতেও চায়নি নেপাল থেকে কোন্ বিস্ময়দ্রব্য তিনি উপহার এনেছেন।

অবশ্য কাউকে দেখাননি বললে একটু ভুল হবে, দেখিয়েছিলেন — মাত্র একজনকে। নিশীথ শিকদার মশাইকে। ভদ্রলোকের সঙ্গে বছর দুই হল আলাপ হয়েছে। থাকেন কলাবাগান হাউসিং এস্টেটেরই 'এ' ব্লকে। 'এ'-ব্লকের বাড়িগুলো 'বি'-র থেকে আরো সুন্দর। ফ্ল্যাটের দামও বেশী। ওগুলোতে থাকেন অভিজাত আর পয়সাওয়ালা মানুষেরা। নিশীথ শিকদারের সঙ্গে আলাপের শুরু কিভাবে হয় তা আজ আর মনে নেই পরিতোষবাবুর। তবে ঘনিষ্ঠতা হতে দেরী হয়নি। অতিশয় অমায়িক মানুষ। লম্বা-চওড়া ফরসা চেহারা, ষাটের কোঠার শেষপ্রান্তে এসেও সৌম্যদর্শন। এখনও সোজা হয়ে হাঁটেন। প্রতিদিন সকালে দু'মাইল হাঁটাহাঁটি করেন গান্ধীজীর মতো জোরে জোরে পা ফেলে। কিছু কিছু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মানুষকে দেখলে মনে হয় এরা পৃথিবীতে শুধু নেবার জন্যেই এসেছে—শ্রদ্ধা ভালবাসা সম্মান টাকাকড়ি—

সব কিছু। শিকদার মশাই সেই জাতের মানুষ। আই.এ.এস. করে সরকারী চাকরি নিয়েছিলেন। পয়সাকড়ি ভালোই করেছেন, তবে দম্ভ নেই। নানা ধরণের শখ আছে শৌখিন মানুষটির। আর সেসব শখ মেটাতে বিস্তর পয়সাও খরচ করেন। ইংরেজী বলেন জলের মতো, খোসমেজাজী। এমন মানুষকে পছন্দ না করার কারণ নেই এবং পরিতোষবাবু নিশীথ শিকদারকে পছন্দই করেন। বলতে কি, ভক্তিও করে থাকেন।

শিকদার মশাই কালেভদ্রে পায়ের ধুলোও দিয়েছেন তাঁর বাড়িতে।

নেপাল থেকে ফেরার পরও এসেছিলেন একদিন। কথায় কথায় বললেন, 'শূন্য হাতেই দেশ-পর্যটন সেরে ফিরলেন নাকি পরিতোষবাবু?' মাঝে মাঝে এরকম সাধুভাষায় কথা বলার অভ্যাস রয়েছে নিশীথ শিকদারের।

পরিতোষবাবু বলেছিলেন, 'নাঃ। কি আর আনব? সেই তো ছিটের পিস, রঙীন ছাতা, ঘড়ি আর টেপ রের্কডার। ওখানে যা আছে সেসব তো কলকাতাতেও আছে। তাহলে আর হ্যামলে পড়ে লাভ কি? নাকি মিঃ শিকদার?'

একজন রিটায়ার্ড আই.এ.এস. কে 'দাদা' বলার চেয়ে 'মিস্টার' বলার দিকে কেন যে পরিতোষবাবুর ঝোঁক তার উত্তর তিনি নিজেও জানেন না। হয়তো কোন এক জায়গায় সম্পর্কগত দূরত্ব ছিল যা পার হয়ে দাদা-ভাইয়ের নৈকট্যে পৌছতে পারেননি।

নিশীথ শিকদার মাথা নেড়ে বললেন, 'সিওর, সিওর। যে ক্যালকাটা নাইনটিন ইলেভেন পর্যন্ত ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার রাজধানী ছিল আজো তো সে সেই ক্যালকাটা। তবে কি জানেন বাইরে এমন জিনিসেরও দেখা মেলে যা শহর কলকাতাতেও পাওয়া যায় না। আমার এক্সপিরিয়েন্স তো সেইরকমই বলে।' নিশীথ শিকদারের কথা শুনে পরিতোষবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল ছোরাটার কথা।

'ঠিক, ঠিক। ভালো কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। দেখুন তো এই জিনিসটা।' বলে বিছানার তলা থেকে খাপে মোড়া ছোরাটা বের করে এনেছিলেন পরিতোষবাবু।

ছোরাটা বেশ আগ্রহের সঙ্গে দেখে নিশীথ শিকদার জিগ্যেস করলেন, 'এ জিনিস পেলেন কোত্থেকে? জেম্বিয়া। ইয়েস, জেম্বিয়া না হয়ে যায় না।'

'কি বললেন— জাম্বিয়া? একটা দেশের নাম না?'

'হ্যাঁ, জাম্বিয়া একটা আফ্রিকান কান্ট্রি।'

'জিনিসটা সেই দেশের বলছেন?'

'না, তা বলিনি। ও একটা অন্য কথা বলছিলাম। তা এটা পেলেন কিভাবে?'

'এক নেপালি ব্যাটা উল্টো পাল্টা বুঝিয়ে গছিয়ে দিয়ে গেল।' পরিতোষবাবু ঘটনাটা সংক্ষেপে খুলে বললেন। তারপর আফশোসের সুরে বলতে লাগলেন, 'আমারও কেমন গুলিয়ে গেল। কিনে ফেললুম, বিস্তর টাকা জলে গেল আর কি. আচ্ছা, আপনি তো উঁচুদরের শিক্ষিত মানুষ, অনেক কিছু জানেন শোনেন। ভালো করে জিনিসটা দেখুন তো মিঃ শিকদার

ওটা কি সোনার? আর ওই পাথর দুটোই বা কি?'

'তাহলে তো বাড়ি নিয়ে গিয়ে দেখতে হয়।'

'তা নিয়ে যান না বাড়ি।'

ছোরাটা বাড়ি নিয়েই গিয়েছিলেন নিশীথ শিকদার। প্রায় দিন চারেক পরে এক রোববারের সকালে আবার তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছিল পরিতোষবাবুর বাড়িতে।

'কিছু বুঝলেন?' পরিতোষবাবু শুধিয়েছিলেন। প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত চেহারাতেই মালুম হয় আগ্রহে ক'দিন তিনি অধীর হয়ে আছেন।

'বিদেশী জিনিস — সেটা ঠিক। নেপালীটা মিথ্যে বলেনি। জিনিসটা আসলে থাইল্যান্ডে তৈরী ইনস্ট্যান্ট অ্যান্টিক। এটা একটা ফেক, জেনুইন নয়।'

এসব শক্ত কটমটে শব্দ-বৃষ্টি শুনে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন পরিতোষবাবু। 'অ্যান্টিক' শব্দটা অচেনা না হলেও 'ফেক' কথাটার মানে জানা ছিল না তাঁর।

'ফেক!'

'হ্যাঁ। মানে — ঝুটো। থাইল্যান্ডে ফেক অ্যান্টিকের ব্যবসা দারুণ চলে। ধরুন, আপনি একজন থাই অ্যান্টিক-ডীলারের কাছে মিং বংশের পানপাত্র চাইলেন। অর্ডার দেবার দু' একদিনের মধ্যেই তা পেয়ে যাবেন। আসলে ওটা নকল, মিং আমলের জিনিসই নয়। কিন্তু হুবহু আসলের মতো। টুরিস্টরা আসল ভেবে নকল কিনে নিয়ে আসে। এভাবেই জিনিসটা নেপালে এসেছিল মনে হয়।'

'তাহলে সোনার ব্যাপারটা—'

'সোনা! হাঃ-হাঃ-হাঃ। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড।' নিশীথ শিকদারের অট্টহাসি থামতেই চায় না, 'সোনা আর গিল্টির তফাৎ বোঝার বয়স আপনার হয়েছে পরিতোষবাবু। সোনা হলে আপনাকে বিক্রী করত? কতো নিয়েছিল?'

'চারশো।'

নিশীথ শিকদার মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন, 'যাক্, অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে। নেপালীটার লোক বাঙ্গাইয়ের ক্ষমতা আছে বলতে হবে। ব্যাটা উপযুক্ত মাথাতেই কাঁঠাল ভেঙেছে। যাহোক, যা হয়েছে তা হয়েছে। বাজে মন খারাপ করবেন না।'

বলে বেশ কিছু সদুপদেশ দিয়ে পরিতোষবাবুর পিঠ-টিঠ সস্নেহে চাপড়ে চলে গিয়েছিলেন শিকদার মশাই।

এরপর নিজের এই বোকামি গোপন করে চলাই পরিতোষবাবু উচিত ছিল। তবে নাকি মানুষ নিজের নির্বুদ্ধিতা নিয়েও কখনও কখনও রসিকতা করতে পছন্দ করে। তাই আরো দু'একজনকে ছোরাটা দেখিয়েছিলেন। তাঁর এক স্কুলমাস্টার বন্ধু হরবিলাস পাত্র আর ছোটছেলে নবনীর প্রাইভেট টিউটর ছোকরাটিকে। জিনিসটা দেখে হরবিলাস আর অল্পবয়সী মাস্টারমশাইটি 'বাঃ, ভারি সুন্দর তো' — এই উচ্ছ্বাস বাক্যের বাইরে কিছু বলেনি।



যাই হোক - এই স্মৃতি রোমন্থনের পর পরিতোষবাবুর মনে হতে লাগল তাঁর ওপর 'ওয়াচ' রাখার পক্ষে ছোরা ছাড়া, ছোরার সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলো নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও আর কোন ব্যাপার ভেবে উঠতে পারলেন না।

অন্যমনস্কভাবে ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলেন। প্রায় নটা বাজে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। বাসে চড়ে একটা ফাঁকা সীট পেয়ে আরাম করে বসবার পর বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই ভাবলেন বাস থেকে নামতে মোটামুটি দশটা বাজবে। এত রাতে সেই নেপালিটা নিশ্চয়ই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে না।

পরিতোষবাবু ভুল ভেবেছিলেন।

।। ৪ ।।

'আমি ভুল ভেবেছিলাম। অতো রাতে ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে চিন্তাই করিনি।' বললেন পরিতোষবাবু।

'ওই কাটা দাগওয়ালা লোকটার সঙ্গে একজন ছোকরাও ছিল। তোর চেয়ে সামান্য বড়ো হবে বয়সে। তবে ঠিক বলতে পারছি না। ভালো করে নজর করবার মতো মনের অবস্থা তখন নয়। বেশ লম্বা আর জোয়ান, এটুকু মনে আছে।'

'ওরা কি ফলো করছিল?'

'না, মোড়ে নেমে কাউকে দেখতে পাইনি। নিশ্চিন্ত হয়ে খানিকটা অসাবধানেই আসছিলুম। হঠাৎ রাস্তাঘেঁষা একটা পাঁচিলের গা থেকে একেবারে গায়ে এসে পড়ল। বাঁয়ে ডানে দাঁড়িয়ে গেল দুজন। কথা বলল কাটা দাগওয়ালা লোকটাই।'

অবনী কথা না বলে কান পেতে রইল। পরিতোষবাবু বলে যেতে লাগলেন, 'বলল — নেপাল থেকে যে ছোরাটা এনেছেন ওটা আমার চাই। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন না, পাঁচ কান করবেন না। শনিবার রাত দশটার সময় — মোড় থেকে এগার নম্বর লাইটপোস্ট — মানে, এই পাঁচিলের কাছটায় আসবেন। চালাকি খেললে জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। ছোরাটা নিয়ে আসতে ভুল না হয়।...... তারপর ওরা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।'

'শুধু এই? ওরা কিছু নেবার চেষ্টা করেনি?'

'না। চেষ্টা করলে ঘড়িটা আর গোটা পনের টাকা যেত।'

অবনী বলল, 'আজ বিষ্যুদবার। তার মানে পরশু রাতে ছোরাটা দিতে হবে। সাত নম্বর — না, না, এগার নম্বর লাইটপোস্ট বললেন না? হ্যাঁ, ওখানে একটা পোড়ো বাড়ির মতো আছে বটে — একটা ভাঙা দেওয়ালও আছে। আমাদের হাতে সময় আছে প্রায় দু'দিন। ঠিক আছে ভাববেন না।'

'তুই কি বলিস — ছোরাটা দিয়ে দোব?'

'সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তবে দেবার দরকার হয়তো হবে না। তার আগেই—'

'তার আগেই — কি?'

'সেসব এখন আপনার শুনে কাজ নেই।'

পরিতোষবাবু ভীত হয়ে বললেন, 'তুই একটা মতলব ঠাউরেছিস মনে হচ্ছে। খুলে বলবি?'

'গোয়েন্দা তার মন্ত্রগুপ্তি কাউকে খুলে বলে না বাবা। এমনকি নিজের সহকারীকেও সবটুকু বলে না। আপনি তো ডিটেকশনের কাহিনী পড়েছেন। হোমস সাহেবও ওয়াটসনকে সমস্তটা বলতেন না। যাই হোক, ছোরাটাই তো এখন পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে ওঠেনি।'

পরিতোষবাবু বিছানার তলা থেকে একটা বুক-কেসে ছোরাটাকে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সেখান থেকে কাগজে মোড়া জিনিসটাকে বের করে ছেলের হাতে তুলে দিলেন। মোড়ক খুলে ছোরাটা দেখতে দেখতে অবনীর চোখে-মুখে নানা ভাবের খেলা চলতে লাগল। বিস্ময়, কৌতূহল, আনন্দ-সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র ভাব। ফলার ধার পরীক্ষা করল আঙুল বুলিয়ে।

নিজের মনে বলতে লাগল, 'জিনিসটা ভারি সুন্দর তো! বেশ মিস্টিরিয়াস ড্যাগার। কখনোও দেখিনি এরকম। অনেকটা পাইরেটদের ড্যাগারের মতো। ওজনেও বেশ ভারী দেখছি। হয় এর বিশেষ দাম নেই, নয় তো অমূল্য।' মুখ তুলে বলল, 'ছোরাটা একদিন আমার কাছে থাক।'

পরিতোষবাবু বললেন,' তুই আবার ওটা নিয়ে কি করবি?'

'দরকার আছে। পরে জানতে পারবেন।'

'হ্যাঁরে, পুলিশকে খবর দিতে হবে নাকি?'

'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, বাবা। চেপে যান।'

'আমার যে বড়ো ভয় করছে রে?'

'কিচ্ছু ভাববেন না। আমি আছি কি করতে? বেঙ্গলের কলেজ চাম্পিয়ান ক্যারাটেতে আপনি-ভুলে যাচ্ছেন কেন? ব্রুস লী-র ছবি দেখেছেন?'

'ব্রুসলী? শুনেছি। নামটা ছেলেছোকরার মুখে।'

'ব্রুসলী একাই দশজনকে হটাতে পারত। আমিও পারি।'

অবনীর দিকে ভালো করে তাকালেন পরিতোষবাবু। অবনী স্লিভলেস গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়েছিল। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মতো উচ্চতা, মোটা হাড়ের কাঠামো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সটান উঠে গেছে দেহ-যষ্টি। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে নীরেট পেশী উপচে পড়ছে যেন। শক্তির স্পর্ধায় শাণিত ধারাল একটা শরীর। পরিতোষবাবু আশ্বস্ত হয়ে মাথা নাড়লেন। ছেলেটা একটু ক্ষ্যাপাটে বটে, তবে অর্থহীন ক্ষ্যাপামি নয়। ক্ষ্যাপামি এরকম ছেলের সাজে।

অবনী বলল, 'শুধু আমি নয়, আমরা। আমার পেছনে আরো দু'একজন বন্ধু আছে। তারা খালি হাতে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মুখোমুখি হতে পারে। আপনি কিছু ভাববেন না। তবে অফিস যেতে হবে না, দু'দিনের ছুটি নিন। আগাথা ক্রিস্টির একটা বই এনেছি। টেন লিটল নিগারস এর অনুবাদ। ওটা পড়ে বরং দু'দিন কাটিয়ে দিন। খুব ইন্টারেস্টিং বই।'

ঘরের মধ্যে পা দিয়েই নিশীথ শিকদার বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার? বাড়িতে যে মেলা বসে গেছে!' বলার কারণ ছিল শিকদার মশাইয়ের। বিছানার ধার ঘেঁষে পরিতোষবাবু চেয়ারে বসে। তাঁর বাঁ দিকে সোফায় বসে অবনীরই বয়সী দুটি ছোকরা। ওরা অবনীর বন্ধু। অবনী বসে নেই, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছিল। পঞ্চম ব্যক্তির প্রবেশে আপাতত চুপ করে গেছে। ঘরে ঢুকে যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই বুঝতে পারবে বেশ একটা উত্তপ্ত আলোচনা চলছিল এখানে। চোখমুখ এবং অন্যান্য অঙ্গের অভিব্যক্তিতে তারই আভাস লেগে আছে। শিকদার মশাইয়ের বুদ্ধির অভাব নেই। তিনি যা বোঝবার বুঝলেন।

একটা খালি চেয়ার টেনে নিতে নিতে বললেন, 'রোববারের সকালটায় বেশ জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, অ্যাঁ! তা কিসের কথা হচ্ছিল? আলোচনায় বিঘ্ন ঘটালাম না তো!' তারপর পরিতোষবাবুর দিকে চেয়ে চমকে উঠে বললেন, 'আপনার কপালে ওটা আবার কি, ভায়া?'

পরিতোষবাবুর কপালে ডান ভুরুর ওপরে একটা স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। তিনি কিছু বলার আগে অবনী বলে উঠল, 'গেল রাত্রে বাবার ওপর একটা ছোটখাট আক্রমণ হয়েছে। বাবার ভাষায় 'অ্যাটাক'।'

নিশীথ শিকদার ট্রাউজার্সের পকেট থেকে পাইপটা বের করতে করতে বললেন, 'অ্যাটাক! ওঁর মতো নিরীহ লোকের ওপর কে আবার হামলা করতে গেল!'

'যার স্বার্থ আছে। কোন মতলববাজের ব্যাপার আর কি!' অবনী বলল। ওর চোখ শিকদার মশাইয়ের ওপর নিবদ্ধ। তিনিও স্থির নজরে অবনীকে দেখতে দেখতে বললেন, 'ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো?'

'ব্যাপার একটা ছোরাটা আপনি দেখেছেন।'

'সে তো একটা ছোরা নিয়ে ফেক অ্যান্টিক।'

'তা নয়, জ্যাঠাবাবু। ওটা ফেক নয়, অ্যান্টিকও নয়। একেবারে হাল আমলের জিনিস।'

নিশীথ শিকদার নড়েচড়ে বসলেন। পাইপটা দাঁতে চেপে চিবিয়ে বললেন, 'এইসব আজেবাজে কথা শোনবার জন্যে সাতসকালে আমাকে আসতে খবর দিয়ে এলে! চাটুকুও মুখে দেবার সময় পাইনি।'

অবনী শান্ত গলায় বলল, 'আপনি আসতেই চা দেবার কথা বলে এসেছি। চায়ের সঙ্গে টাও পাবেন।'

শিকদার মশাই থমথমে গলায় বললেন, 'অ্যান্টিক ঘেঁটে ঘেঁটে চুল পাকালুম। তুমি সেদিনের ছোকরা, আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছ?'

'ভুল বুঝেছেন। আমি বলতে চাইছি যে ছোরাটা অ্যান্টিক বা ফেক কোনটাই নয়। আর অ্যান্টিক ঘেঁটে ঘেঁটে চুল পাকিয়েছেন বলেই আপনি সেটা ভালো করে জানেন।'

'তোমার বক্তব্য একটু খোলসা করে বলো তো। কি ওটা?'

'ওটা জেম্বিয়া: এ-ছোরা উত্তর ইয়েমেনের লোকেরা এখনও ব্যবহার করে।'

নিশীথ শিকদার বাঁকা সুরে বলে উঠলেন, 'তুমি তো অনেককিছু জানো দেখছি। প্রত্নতত্ত্বের চর্চা কবে থেকে শুরু করলে হে?'

'আজ্ঞে আমার বিষয় দেহচর্চা, প্রত্নতত্ত্ব নয়। তবে জিনিসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে যাঁরা আপনারই মতো চুল পাকিয়ে ফেলেছেন তাঁদের একজনের কাছ থেকেই জেনেছি। হরিজীবন সান্যালের নাম শুনেছেন?'

'বিলক্ষণ। ভদ্রলোকের তো অ্যান্টিকের ওপর অনেক রিসার্চ-ওয়ার্ক আছে। ইনকাদের-অরনামেন্টের ওপর সম্প্রতি একটা কেতাবও লিখেছেন। রিয়েলি আ গুড বুক।'

'তিনিই বলেছেন,— ছোরাটা জেম্বিয়া।' অবনী বলে যায়, 'আমার এই দুই বন্ধুর ভেতর যে বেশী লম্বা ও খবরের কাগজে ফ্রিলান্স করে। সান্যাল সাহেবের একটা ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ ওর। এই বন্ধুর যোগাযোগেই পরশুদিন মিঃ সান্যালের কাছে গিয়েছিলাম। বুঝতেই পারছেন আমার কোন ক্রেডিট নেই — ছোরাটা সম্পর্কে যা-কিছু জ্ঞান তা ওই প্রত্ন-বিশারদের কাছ থেকেই পাওয়া।'একটু থেমে অবনী আবার বলতে শুরু করে, 'জেম্বিয়ার হাতল গন্ডারের খড়্গ দিয়ে তৈরী। ওপারে সোনার সেটিং — গিল্টিনয়, পিওর গোল্ড। সাদা আর লাল পাথর দুটো সামান্য দামের নয়। সাদাটা রেয়ার জাতের ডায়মন্ড। সান্যাল সাহেব নামটা বলেছিলেন, ভুলে গিয়েছি। লাল রঙের পাথরটা চুনি, লোকে যাকে পদ্মরাগ মণি বলে। উনিই বলেছেন— এই জেম্বিয়াটার দাম লাখ টাকা হলেও উনি অবাক হবেন না। মিঃ সান্যাল জেমারিতে বিশেষজ্ঞ। ভুল হবার কারণ নেই। নর্থ ইয়েমেনীজদের প্রতিটি পুরুষ বারো বছর বয়স পার হলেই সঙ্গে জেম্বিয়া রাখে। এটা ওদের সামাজিক প্রথা আর মর্যাদার অঙ্গ। জেম্বিয়া যে পুরুষের সঙ্গে থাকে না সমাজে তার অবহেলা জোটে। ওটা স্ট্যাটাস সিম্বলও বলতে পারেন। প্রশ্ন হতে পারে জেম্বিয়ার মতো ব্যয়সাধ্য জিনিস কেনার অর্থ ওরা পায় কোত্থেকে? উত্তরটা কঠিন কিছু নয়। উত্তর ইয়েমেনের লোকেরা আরব রাষ্ট্রগুলোর তেলের খনিতে কাজ করার সুবাদে প্রচুর টাকা রোজগার করে। জেম্বিয়া কেনার পয়সা সেখান থেকেই আসে। 'তাছাড়া জঙ্গলে পোচিং করে ওরা গজদন্ত আর গন্ডারের খড়্গ যোগাড় করে। এই নিষিদ্ধবেআইনী ব্যবসাতেও ওরা ফেঁপে উঠেছে।'

নিশীথ শিকদার মৃদু মৃদু হাসছিলেন। খুশি খুশি ভাব গলায় ফুটিয়ে বললেন, 'বাঃ, একদিনেই তুমি অনেক কিছু জেনে এসেছ দেখছি। ভালো, ভালো।'

'আপনি এসব আগে থেকেই জানতেন শিকদার মশাই।' পরিতোষবাবু এই প্রথম মুখ খুললেন, 'মনে আছে ছোরাটা প্রথম দিন দেখতে দেখতে আপনি 'জেম্বিয়া' কথাটা দু'বার উচ্চারণ করেছিলেন। আমি অবিশ্যি কথাটাকে'জাম্বিয়া' বলে ভুল করেছিলাম। তা আপনি আমার ভুল ভেঙে দেননি।'

'বেশ তো আমি না হয় জানতাম— ওটা জেম্বিয়া, তাতে কি হল?'

অবনী বলল, 'তাতে এই হল যে ছোরাটার ওপর আপনার লোভ পড়ল। অ্যান্টিকের চর্চা করেন আপনি। দেশ বিদেশের নানা বিচিত্র জিনিসের ওপর আপনার ঝোঁক থাকা স্বাভবিক, তা সে প্রত্নদ্রব্য হোক আর না-ই হোক। আপনার শো কেসে একটা জেম্বিয়া থাকলে একটা সংগ্রহও বাড়ল, আবার বিক্রী করে দিলেও যথেষ্ট টাকা আসে। অ্যান্টিক ডীলারদের সঙ্গে আপনার যে ভালোরকমই চোনাজানা আছে সে-খবর অনেকেই জানে।'

নিশীথ শিকদারের ফর্সা মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। তেঁতো গলায় বললেন, 'অবনী, তুমি সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছ। ভুলে যেও না আমি একজন রিটায়ার্ড আই.এ.এস.। সরকারী মহলে এখনও যথেষ্ট খাতির আছে।'

'আপনি মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন জ্যাঠাবাবু। অপরাধ হচ্ছে অপরাধ।'

'সে তো ঠিক কথা। কিন্তু আমার অপরাধটা কোন্‌খানে?'

'অপরাধটা ভয় দেখিয়ে এবং হামলা করে জেম্বিয়া অপহরণের চেষ্টার।'

'অভিযোগ তো আনলে — প্রমাণ?'

'কাল রাতে যে দুজন নেপালীকে আমরা পাকড়েছি তারা সব স্বীকার করেছে। ওরা অবশ্য নিরীহ লোক — আপনার এক বন্ধুর কারখানার দারোয়ান। বন্ধুকে বলে ওদের বাবাকে ফলো করার কাজে লাগিয়েছিলেন। প্রথমে লাগান একজনকে। মাঝবয়েসী, মুখে কাটা দাগ। পরে আর একজনকে লাগানো হয়, সে ছোকরা বয়েসী। ওরা বাবাকে রাস্তায় আটকে এমনভাবে শাসায় যাতে করে মনে হতে পারে ব্যাপারটার পেছনে একটা শক্তিশালী অপরাধী-চক্র রয়েছে। শনিবারে ছোরাটাকে একটা বিশেষ জায়গায় দিয়ে আসতে বলে। এও বলে যে ব্যাপারটা পুলিশকে জানালে বাবার প্রাণ যাবে। কিন্তু এসব তো আপনি জানেন। আমরা যে জাল পাতব এটা অবশ্য আপনার জানা ছিল না। ভেবেছিলেন বাবা নিরীহ মানুষ, সুড় সুড় করে জেম্বিয়াটা দিয়ে আসবে, কোনরকম ঝামেলা হবে না। মাঝখানে যে আমি আর আমার বন্ধুরা যাবো সে আপনি জানবেন কি করে? তো আমরা জাল পাতলাম। ওরা ধরা পড়ল। এই বাড়িরই নিচের তলার গ্যারাজে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছি। ধস্তাধস্তির সময় বাবার কপালে সামান্য চোট লাগে। স্টিকিং প্লাস্টারটা সেজন্যই। ওদের দু'চারটে রদ্দা মারতেই গড়াগড় করে বলে দিয়েছে। যদি চান তো ওদের এখানে এনে স্বীকারোক্তিটা আপনার সামনেই করিয়ে নিই। এই দারোয়ান দুটো যার কারখানায় চাকরি করে সেই বন্ধুটিকেও আনা যেতে পারে দরকার হলে। তার কি কোন দরকার আছে জ্যাঠাবাবু?'

নিশীথ শিকদারের মুখে ঘন ঘন রঙ্ বদলাচ্ছিল। বাক্‌পটু মানুষ যেন কিছু বলবার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

অবনী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের থানার নতুন ও.সি. র সঙ্গে একদিন আলাপ হল। ফ্রেস ইয়াং ম্যান আর খুব অনেস্ট। পেশা এখনও ভদ্রলোককে গ্রাস করেনি। উনি আই.এ.এস. টাই. এ. এস. বোঝেন না। তাও আপনি তো রিটায়ার্ড। একজন রিটা

মানুষকে অকারণ ঝক্কিতে ফেলার জন্যে একটা ডায়রি করে আসা যেতেই পারে। ও সি সঙ্গে সঙ্গে স্টেপ নেবেন জোর করে বলতে পারি। তবে এতদিন তো আপনাকে জ্যাঠাবাবু বলে এসেছি। তাই অসম্মান করতে চাই না। এক্ষেত্রে শার্লক হোমস যা করতেন আমরাও তাই করব ঠিক করেছি। কখনও কখনও এই গোয়েন্দাটি অপরাধী সনাক্ত করেও তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। স্রেফ মানবিকতার খাতিরে। আপনি কি কনান ডয়েলের 'দি অ্যাডভেঞ্চার অব্ দি ডেভিলস্ ফুট ' আর 'এ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া'— গল্প দুটো পড়েছেন জ্যাঠাবাবু ?'

নিশীথ শিকদার এবারও নিরুত্তর।

'না পড়লে পড়ে নেবেন।' অবনী বলল, 'একটু পরে নেপালী দুটোকে ছেড়ে দোব। বেচারারা বড়ো কান্নাকাটি করছে। দেখি আপনার চায়ের কদ্দূর কি হল।'

বলতে বলতেই নবনী চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সিঙ্গাড়ার প্লেট।

'জ্যাঠাবাবু, আপনার চা।' নবনী ট্রে-টা চা-টেবিলে নামিয়ে রাখল, 'সিঙ্গাড়াগুলো বাড়িতে ভাজা। মা গরম গরম খেয়ে নিতে বললেন।'

নিশীথ শিকদার ধোঁয়া ওঠা চায়ের পেয়ালা কিংবা সিঙ্গাড়ার প্লেটের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। মুখ থেকে নিভে-যাওয়া পাইপটা নামিয়ে, চাকুরি- জীবনে অভ্যস্ত মাথা উঁচু করে গট্ গট্ করে চলার ভঙ্গিটা বেমালুম বদলে, আর মাথাটা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমেও গেলেন বোঝা গেল কিন্তু তাঁর জুতোর শব্দ একটুও কানে এল না ঘরের ভেতরের মানুষগুলির।

পরিতোষবাবু বললেন, 'আগাথা ক্রিস্টির বইটা বেশ লাগল, বুঝলি অবনী ? তুই কাণ্ডটাও করলি ঠিক ওই এরকুল পোয়ারোর মতো। তবে ঐ চটুবাজ আমাকে না বললে তো তোর কথা আমার মনেই পড়ত না। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ তো দিতেই হবে, একদিন খাইয়েও দিতে হবে পেট পুরে।'

অবনী করুণ মুখ করে বলল, 'না রে, আমি যে এত খেটে মরলুম! আমি কি পাচ্ছি? শুকনো ধন্যবাদে কিচ্ছু হবে না, বাবা। আমার বন্ধুদের খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু। খুব হেল্প করেছে ওরা।'

'আহা তোর তো ওই ভেস্পিয়াটাই রইল। ছোরা-ছুরি নিয়ে আমি কি করব? বন্ধুরাও খাবে বৈকি।'

দীর্ঘ আটদিন পরে পরিতোষবাবু স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমোতে পারলেন। এমন গাঢ় নিদ্রা বহুকাল তাঁর হয়নি।

একজন মানুষের গল্প

একটা উঁচুমতো ঢিবির ওপর গাছগাছালির বেড়াঘেরা খানিকটা ফাঁকা চত্বর। এর একধারে একটা দোচালা ঘর। লোকে বলে রাঘব সর্দারের আখড়া। একটা রাস্তা গাঁ থেকে বেরিয়ে, আখড়ার পাশ দিয়ে ফাঁকা মাঠের দিকে চলে গিয়েছে।

অভীক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল,—রাঘব জ্যাঠা আছ নাকি ?

আছি। ভেতরে এসো।—গম্ভীর গলার আওয়াজ ভেসে এল।

অভীক ভিতরে ঢুকল। দোচালার নিচের উঠোনে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি মানুষপ্রমাণ একটা তেলপাকানো লাঠি নিয়ে উবু হয়ে বসে কি যেন ভাবছিল। মিশমিশে কালো গায়ের রঙ, চওড়া পেশীবহুল বুক, হাত-পা গাঁট-গাঁট। হাতের লাঠিটার সঙ্গে লোকটির চেহারার কোথায় যেন মিল আছে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও শরীরে যে প্রচুর শক্তি ধরে, তা দেখলেই বোঝা যায়। গলায় কন্ঠী, কপালে তিলক। বোষ্টম।

কিন্তু বোষ্টম হলেও দুর্দান্ত লাঠিয়াল। তবে তার লাঠি কখনও ন্যায়ের বিরুদ্ধে যায় নি।

অভীক ঘাসজমির ওপর বসে পড়ে বলল,—কেমন আছ জেঠু ? আখড়া কেমন চলছে ? কাউকে দেখছি না যে! মাস ছয় হল গাঁয়ের দিকে আসা হয়নি।

রাঘব সর্দার কেমন যেন কষ্টের হাসি হাসল,—তুমি দেখছি গাঁয়ের হালচাল তেমন জানো না। তা শহরের অবস্থা কিরকম ?

— কলকাতার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ভিখিরিতে শহর ছেয়ে গেছে।

--- এখানেও তো সব মরেহেজে ফাঁকা হয়ে গেল। দিনকাল যা যাচ্ছে তাতে কে আর লাঠিখেলা শিখতে আসবে? পেটে ভাত জোটে না, লাঠি ধরার শখ আসবে কোত্থেকে ? ইদিকবাগে কত ভিটে বেমালুম শূন্যি হয়ে গেল।

— বলছ কি জেঠু ?

— ঠিকই বলছি বাপধন। আকাল এসে দেশটার পাঁজর একেবারে ঝরঝরে করে দিয়েছে। আমার আখড়ায় কেউ আর সিধে নিয়ে আসে না। চাষবাস তো করিনি কখনও। শিষ্যদের দেওয়া সিধেতেই পেট চলত। এখন বাসিভাত পান্তাভাত পর্যন্ত লোকের রান্নাঘর থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকের গাঁ-গেরামগুলোতে খুন জখম ডাকাতি চলছে খুব। এই তো পরশু দিনের কথা। দোগেছের হাটে মস্ত বড়ো দুটো চালডালের আড়ত লুঠ হয়ে গেল।...আমাদের আখড়ার দুলাল মারা গেছে শুনেছ বোধহয় ?

অভীক খবরটা জানত না। অবাক হয়ে বলল,—সেকি ?

অভীক খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না। সে তো এসবের কিছুই জানত না। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল। দুলাল, কার্তিক ভারি মিষ্টি ছেলে ছিল। আখড়ায় ওদের সঙ্গে লাঠিখেলা শিখতে শিখতেই তো সে বড়ো হল।

কলকাতায় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে। থার্ড ইয়ারের ছাত্র। সবে গতকাল সন্ধেয় বাড়ি এসেছে। এসেই এই রাঘব সর্দারের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। মানুষটিকে সে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। ভারি সাচ্চা লোক।

রাঘব সর্দার গলা নামিয়ে বলল,—তোমাকে একটা কথা বলি বাপ। অন্যভাবে নিও না। তোমাদের আড়তের দিকে অনেকের একটু নজর আছে। এ দিগরে কোথাও ফসল হয়নি। অথচ তোমার বাপের আড়তে রাশি রাশি চাল-ডাল-ধানের বস্তা মজুত। মরার আগে মানুষ একটিবার বাঁচবার চেষ্টা করবে।...কি বলছি বুঝতে পারছ বোধ হয়।

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। না বোঝার কারণ নেই। অভীক বুঝতে পারল। তার বাবা হরেন মণ্ডল মস্ত আড়তদার। ধর্মঘাটার গঞ্জে, কুন্তী নদীর ধারে, তার প্রকাণ্ড দুটো দোকান। একটা ধানচালের, অন্যটা কাপড়ের। অন্তত একডজন কর্মচারী সেখানে খদ্দেরের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খায়। হরেন মন্ডল যুদ্ধ লাগাতক ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তারপর এল এই আকাল। সে তো কারো পক্ষে সর্বনাশ, কারো পক্ষে পৌষমাস। দুর্দিন ভাঙিয়ে হরেন মন্ডল মশাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তুলছে ঘরে। সৎপথে যে আসছে না তা বোঝার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি আছে অভীকের। বাবার জন্যে তার কষ্ট হয়, আবার রাগও হয়।

রাঘব সর্দার অভীকের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল। কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। বলতে আটকাল বোধ হয়। তারপর আস্তে আস্তে বলল,—গাঁয়ের কথা একটু ভেবো। তোমার আখড়ার ভাইদের কথাও ভুলে যেও না। ওরা কষ্টে আছে।

ক'দিন আছি। আবার আসব। —এই বলে আখড়া থেকে বেরিয়ে এল অভীক। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেঠুর কথাই ভাবতে লাগল সে। আশ্চর্য মানুষ। নিজের অভাবের কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারল না। জেঠুর শরীর খারাপের রহস্যটা ধরতে পেরেছে সে। ঠিকমতো খেতে পাচ্ছে না। অথচ সাংঘাতিক খাইয়ে লোক। সর্দার জেঠুর সঙ্গে তার সম্পর্ক

তো কম দিনের নয়। তাকে প্রায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। নিজের হাতে লাঠিখেলা শিখিয়েছে। তারপর তো সে শহরে চলে গেল লেখাপড়া করতে। আর তেমন আসা হয় না গ্রামে। তবে কালেভদ্রে এলেই জেঠুর সঙ্গে দেখা করতে ছোটে।

ওদের গ্রামটার নাম নিমতলী। হাওড়া জেলার দক্ষিণে, বড় গাঙ থেকে খুব দূরে নয়। গেল সনে আশ্বিন নাগাদ যখন সাগর থেকে উঠে আসা দৈত্য এদিকের গ্রামগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে গিয়েছিল, আর মানুষ জীবজন্তু শস্য—যা কিছু সামনে পেয়েছে ছিঁড়েকুটে একশা করে গিয়েছিল, তখন সে কলকাতায়। পরে এসে সব শুনেছিল। কিন্তু বুঝতে পারেনি যে বিধ্বংসী ঝড়ের পরের অবস্থাটা আরো সর্বনাশা। বছর ঘোরার আগেই এসে গেল মহামারী, মন্বন্তর। এর কিছুটা আঁচ সে শহরে বসেই পেয়েছিল। অনেকদিন পর গ্রামে এসে সেটা রীতিমতো টের পাচ্ছে।

কিন্তু এই আকাল-রাক্ষুসীকে তার একার চেষ্টায় তাড়াবার সাধ্য কোথায় ? তবে চেষ্টা করে দেখতে হবে। নাহলে সে মানুষ কিসের ?

অভীকের চোখের সামনে ভেসে উঠল কুন্তী নদীর ধারের প্রকাণ্ড দুটো আড়তের ছবি। আর অমনি কিসের একটা শপথ ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর দু'চোখে।

।। দুই ।।

মাছের মুড়ো দিয়ে জুঁইফুলের মতো সাদা ভাত মুখে তুলতে তুলতে হরেন মণ্ডল জিগ্যেস করল,—তোর খিদে নেই নাকি অভী? সেই থেকে শুধু ভাত নাড়াচাড়া করছিস? রান্না ভাল হয়নি?

হয়েছে। তেমন খিদে নেই।—সংক্ষেপে জবাব দিল অভী।

প্রকাণ্ড দরদালানে হ্যাজাকবাতি জ্বলছিল। আলোর ছটায় চারদিক যেন দিন হয়ে আছে। অভীক গুণে দেখল দশটা বাটি তার পাত ঘিরে সাজানো। শুধু মাছের ব্যঞ্জনই তিনরকম। একেবারে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন। হরেন মণ্ডল মানুষটার চেহারা বেশ দশাসই। গলায় থাক-থাক চর্বি। খাইয়ে লোকের চেহারা। বিভিন্ন ব্যঞ্জন তুলে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল মোড়লমশাই। আর তা দেখতে দেখতে গলা ঠেলে কি যেন উঠে আসতে চাইছিল অভীকের।

এমন সময় দূর থেকে হরিধ্বনি ভেসে এল।

হরেন মণ্ডল বলল,—রোজই যাচ্ছে দু'একটা করে। এ বোধহয় পরাণ দাস। শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে। দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী, মাগো। ভালো রেখো মা।

অভীক নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—মধ্যিপাড়ার পরাণকা ? কি হয়েছিল ?

হরেণ মণ্ডল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল,—হবে আবার কি. [illegible]দের জ্বালায় চলে গেল। বেঁচে গেল এ যাত্রা। তুই খুব খারাপ সময়ে দেশে এলি। রোগ ব্যাধিও হচ্ছে, আর চারদিকে হাওয়াও খুব গরম। মানুষের এখন মতিগতি বোঝা ভার। এত কষ্ট করার পর ভগবান একটু মুখ তুলে চেয়েছে—মানুষের সেটা সইছে না। হরেন মণ্ডলের আড়তের দিকে সবার চোখ। বড় দারোগার কাছে একটা বন্দুকের আর্জি পেশ করেছিলুম তা ব্যাটা কানে তুললে না। পান

খাবার জন্যে কিছু ধরে দিতে চেয়েছিলুম, তাতেও গা করলে না। ধড়িবাজ লোক। আগের বড় দারোগাটা ভাল ছিল।

অভীক একতরফা শুনে যাচ্ছিল। সে কিছু বলছে না দেখে হরেন মন্ডল বলল,—কিছু বলছিস না যে! তুই বরং দু'একদিন পর শহরে ফিরে যা। সময়টা খারাপ যাচ্ছে।

অভীক হঠাৎ বলল,—আমার ক'বস্তা চাল দরকার বাবা।

চাল!—শব্দটাকে হরেন মন্ডল এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন ছেলে তার কাছে কয়েক বস্তা সোনা চেয়েছে। একটু সামলে নিয়ে বলল,—চাল নিয়ে কি করবি ?

— অভাবী লোকদের দেবো।

— চাল কি মাগ্না পাওয়া যায় যে বিলিয়ে দিতে হবে ?

— তোমার আড়তভরা চাল-ডাল আছে বাবা। কিছু দিলে তুমি ফতুর হয়ে যাবে না। আর গরীবরা তো তোমায় দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

— আমি কারো আশীর্বাদের ধার ধারি নাকি ?

অভীক আবেগকাঁপা গলায় বলল,—জানো বাবা, রাঘব জ্যাঠার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। আখড়ায় কেউ সিধে দিতে আসে না। আখড়ার কিছু ছেলেকে জ্যাঠাই তো পুষত। জ্যাঠাই খেতে পায় না তো তাদের কি দেবে ?

তা অমি কি করব ?—হরেন মন্ডল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল,—আমাকে কি দাতাকর্ণ পেয়েছ? ব্যবসা করি, দানছত্তর খুলে বসিনি। ...আর ওই রেঘোটার কথা আমাকে বলিস না। লোকে বলে আখড়ার ছেলেদের নিয়ে ও ডাকাতের দল খুলেছে। রেঘোর চেহারাটাও তো ডাকাতেরই মতো।

— না বাবা। রাঘব জ্যাঠা খুব সাচ্চা মানুষ, আমি জানি।

— জানিস তো জানিস। ...ওকে আড়তে কাজ দিতে চেয়েছিলুম। কাজ বলতে রাতের বেলা আড়ত পাহারা দেওয়া। তা আমাকে দু'দশটা মন্দ কথা শুনিয়ে হাঁকিয়ে দিলে। না, না, চাল-টাল আমি দিতে পারব না।

অভীক অনুনয়ভরা গলায় বলল,—কিছু করো না বাবা, সবাই তো তোমার গাঁয়েরই লোক।

হরেন মন্ডল গর্জন করে উঠল,—খুব যে লম্বাচওড়া বুলি আওড়াচ্ছিস! এইজন্যেই তোকে লেখাপড়া শেখাতে শহরে পাঠাতে চাই নি। তোর বড়দা মেজদা লেখাপড়াও শেখেনি, শহরও যায়নি। ঘাড় হেঁট করে সব কথা শোনে। দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছে। —না, আমার এক কথা। চালের চেয়ে এখন সোনা সস্তা।

— এটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না।

অভীক এমনভাবে কথাটা বলল যে শুনে হরেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মস্ত ভুল করে ফেলেছে। ঝানু ব্যবসাদার হয়ে এমন ভুল কি করে করল, তাই ভেবে নিজের আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছিল হরেন মন্ডলের।

।। তিন ।।

ধর্মঘাটা গঞ্জের বড় দুটো আড়তই হরেন মন্ডলের। বছর পঁচিশ আগে, হরেন তখন যুবক, মথুরা দলুইয়ের গোলদারি দোকানের সামান্য একজন কর্মচারী ছিল। করিৎকর্মা মানুষটি ভাগ্য আর বুদ্ধির জোরে আজ গঞ্জের সবচেয়ে ধনী লোক।

কর্মচারী থাকতে থাকতেই হরেন মন্ডল আলাদা দোকান খোলে। তারপর যুদ্ধ বাঁধতেই ফুলেফেঁপে কলাগাছ। মথুরা দলুই আজ যে ফকির, আর হরেন মন্ডল আমীর—এর পেছনে কারসাজি আছে বলে জনরব।

এই মন্বন্তরের দিনে কোথা থেকে এত ধানচাল আসে বলা শক্ত। লোকে বলে দোগেছের হাটে আড়ত লুঠের পেছনেও হরেন মন্ডলের কলকাঠি আছে। সত্যিমিথ্যে যাচাই করতে যাবে, এত বড় বুকের পাটা কার ? একদিকে থানার ছোট দারোগা ওর হাতের মুঠোয়, অন্যদিকে তিনজন ভীমকায় ভোজপুরী দারোয়ান সর্বক্ষণ ওর আড়ত আগলে আছে। নিরুপায় মানুষ শুধু অসহায় আক্রোশে ফোঁসে।

হরেনের আড়তের পাশের দোকানটি কাঠ-কেরোসিনের। মালিকের নাম ব্রজমাধব দাস। দাসমশাই বলে,—হরেনবাবু, আবহাওয়া কিরকম বুঝছেন ?

হরেন মন্ডল আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে,—চালের দাম তো দুনো চৌদুনো। ভালই চলছে।

ব্রজমাধব কপাল চাপড়ায়,—আমারই অদৃষ্ট মন্দ। যার দু'মুঠো জুটছে, বন থেকে কাঠ কেটে ফুটিয়ে নিচ্ছে। আর কেরোসিনের তো দরকারই নেই, যাদের কাপড় চোপড়ের অভাব তাদের পক্ষে তো অন্ধকারই ভাল। দেশটার কি হল মশাই ?

— এরকম দু'এক বছর থাকলে কারো কারো কপাল ফিরে যাবে।

ব্রজমাধব শিউরে উঠে বলে,—বলেন কি হরেনবাবু ? তাহলে যে মানুষ বলে কিছু থাকবে না।

— সবাইকে কি আর মানুষ বলা যায় ? তুমিই বলো না। যারা যাবার যাবে, যারা থাকার থাকবে।

— অমন করে বলবেন না মোড়লমশাই। অনেকে আপনার ওপর রেগে আছে। কানাঘুষোয় বহু কথা শুনছি। সেজ ছেলেটার খোঁজখবর রাখেন ?

— কেন বলতো ?

— রাঘব সর্দারের কাছে রাতবিরেতে ওর এত যাতায়াত কিসের ? তেওর-বাগ্দী পাড়াতেও যাচ্ছে ঘনঘন। কখন ফেরে খবর রাখেন ?

— সে ওর মা জানে। আমার সঙ্গে তেমন দেখাই হয় না। তবে ফিরতে বেশ রাত হয় শুনেছি।

ব্রজমাধব চিন্তিত গলায় বলল,—ভাল কথা নয়। ও যদি লোকজনকে খেপিয়ে দেয় আমাদের সকলেরই বিপদ।

হরেন মন্ডল হেসে উঠল,—একটা পুঁচকে ছেলেকে এত ভয় ?

কিন্তু ব্রজমাধবের চিন্তিত মুখ দেখে ব্যাপারটা ঠিক বুঝল বলে মনে হল না।

রাত ন'টা নাগাদ বাড়ি ফিরে হরেন মন্ডল স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল,—অভী ফিরেছে ?

— না।

— এত রাত পর্যন্ত থাকে কোথায় ? কি করে ?

অভীকের মা বলল,—আমি কি করে জানব ? তুমি তো ধানচাল আর টাকাপয়সা ছাড়া কিছু বোঝ না। ছেলেটা অ্যাদ্দিন পরে বাড়ি এল, তার সঙ্গে দুটো কথা বলা—সে সময়ও তো তোমার নেই।

— বাড়ি এলে বলে দিও এসব চলবে না।

অভীর মা আর কি বলবে ? চুপ করে রইল। হরেন মন্ডল বলতে থাকে,—গাঁয়ে এত ভদ্দরলোক থাকতে যতো সব ছোটলোকের সঙ্গে ওর মেলামেশা! এসব ভাল নয়। ...এত রাত হল, গেল কোথায় ছেলেটা ?

।। চার ।।

সর্দার বলছে,—আমাকে তুমি ডাকাতি করতে বলছ বাপধন ?

অভীক বলছে,—না, ডাকাতি নয়। এ হচ্ছে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া। দেশের অন্নে দেশের সবার অধিকার আছে। তা শুধু গোটাকতক লোকের ভোগে লাগবে এ অন্যায়, এ জুলুম।

সর্দার বলছে,—কি জানি, এসব কথা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।

— জেঠু, আখড়ার ছেলেগুলো মারা পড়ছে, এটা দেখতে পাচ্ছ না ? গ্রামটার কি হাল হয়েছে নজরে পড়ছে না! ছেলেদের তুমি শুধু লাঠি ধরতেই শেখালে ? অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শেখালে না ?

রাঘব সর্দার মাথা নেড়ে বলল,—আমার শরীরে আর সে জোর নেই রে বাপ।

— তুমি তো একলা নও সর্দার। আখড়ার ছেলেরা আছে। গোটা গ্রাম তোমার পেছনে।

— বলছিস ?

— বলছি। আমি কোনো অন্যায় কাজ করতে তোমাকে বলতে পারি ?

— না তা নয়। কিন্তু লাঠি চালাব কোথায় ?

অভীক তখন রাঘব সর্দারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বলে ফিসফিসিয়ে। সর্দার চোখ বড় বড় করে বলে,—আই বাপ্, সে যে তোর—

রাঘব সর্দার কথাটা শেষ করতে পারে না। অভীকের হাত এসে চেপে ধরে সর্দারের মুখ।

।। পাঁচ ।।

ভরপেট খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেবার পর বেশিক্ষণ কাটেনি। এমন সময় রাতের আঁধার চমকে দিয়ে প্রচন্ড হৈ-হল্লার আওয়াজ ভেসে এল। বড় ছেলে ঘরে ঢুকে বলল,—বাবা ওঠো, আড়ত লুঠ হচ্ছে।

কাদের ?—ঘুম জড়ানো অবস্থায় বলল হরেন মন্ডল।

— আমাদের। এইমাত্র খবর পেলাম।

মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল মণ্ডল মশাইয়ের। দুই ছেলেকে নিয়ে ছুটল গঞ্জের দিকে। কিন্তু আড়তের কাছে ঘেঁষার সাধ্য কার! লাঠি হাতে শয়ে শয়ে মানুষ ঘিরে আছে দোকান দুটোকে। জ্যোৎস্নার আলোয় শুধু কালো শরীর। শুধু একজনকেই একটু আলাদা করে চেনা যায়, সে রাঘব সর্দার। কিন্তু এখন সে আর বিনয়ী বৈষ্ণবটি নয়, তার গলায় ভৈরব হুঙ্কার। ভোজপুরী দারোয়ানদের সঙ্গে লড়াই বেঁধেছে। রাঘব সর্দারের লাঠি লোহার শাবলের মতো আছড়ে পড়ছে তাদের ওপর। জলস্রোতে যেমন কুটো ভেসে যায় তেমনি মাইনে-করা পালোয়ানগুলো ভেসে গেল জনস্রোতে।

— এক বস্তা চাল এক বস্তা সোনা। না, তার চেয়েও বেশী। ভাই সব, লুটে পুটে নাও।

গলাটা দূর থেকে অভীকের বলেই মনে হল হরেন মণ্ডলের। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

সকালবেলা পুলিশ এসে রাঘব সর্দারকে ধরে নিয়ে গেল। আড়ত লুঠের অভিযোগে। রাঘব তিলমাত্র বাধা দিল না। হাসিমুখে বলল,—চলুন দারোগাবাবু। আমার কোনো দুঃখ নেই। অ্যাদ্দিন শুধু একজনেরই পেট ভরছিল, এবার অনেকের পেট ভরার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ডাকাতি করে কোনো অন্যায় আমরা করিনি।

ছোট দারোগা ধমক দিয়ে বললেন,—সেটা আইন বুঝবে।

হাতকড়া বেঁধে দারোগা সাহেব রাঘব সর্দার এবং আখড়ার কয়েকজন ছেলেকে থানায় নিয়ে গেলেন বটে কিন্তু সেখানে ভিড়ের চেহারা দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। চার-পাঁচটা গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক এসেছে। সর্দারের তারা মুক্তি চায়।

হরেন মণ্ডল বলল,—এ তো জুলুম! দেশে আইন নেই?

বড় দারোগা দূরে কোথায় কাজে গিয়েছিলেন, সবে ফিরেছেন। ঘটনাও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। বললেন,—আইন থাকলে হাতকড়া তো আপনার হাতেই আগে পড়ার কথা মোড়লমশাই। দোগাছির আড়ত লুঠের পেছনে কার কলকাঠি, তা আমরা জানি বৈকি। আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে গলে গেছেন, ছুঁতে পারিনি আপনাকে।

ভিড়ের ভিতর থেকে অভীক এগিয়ে এসে বলল,—রাঘব সর্দারের কোনো দোষ নেই। আমিই আড়ত লুঠের উসকানি দিয়েছিলাম। আমাকে গ্রেপ্তার করুন।

হরেন মণ্ডল কেঁদে উঠে বলল,—করবেন না দারোগাবাবু। ও আমার ছেলে। ওর মাথা খারাপ। ওর কথা ধরবেন না।

বড় দারোগা হাসলেন,—মাথা ওর ঠিকই আছে। বাপের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছেলে ছাড়া কে করবে? গ্রেপ্তারের প্রশ্নই উঠছে না। করলে আপনাকেই করা উচিত হরেনবাবু। শুধু ওরকম ছেলের বাপ বলেই আপনার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নিচ্ছি না। আর শুনুন, আইনের বাধা না থাকলে থানার আন্ডারে যত আড়ত আছে আমি দাঁড়িয়ে থেকে সব লুঠ করাতাম।

রাঘব সর্দার সহ সকলে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

নাম মাহাত্ম্য

নিশাকরবাবু তাঁর নামটি নিয়ে কোনদিনই তুষ্ট নন। তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা নয়। বরং কালো বললেই ঠিক হয়। যার গায়ের রঙ ময়লা তার নাম নিশাকর হতেই পারে। কারণ 'নিশা' শব্দটার মধ্যে রাত্রির ব্যাপার-স্যাপার আছে, আর রাতের রঙ তো কালোই, এমন কি সেটা জ্যোৎস্নারাত হলেও। কিন্তু তিনি কৃষ্ণবর্ণ বলে তাঁর নাম নিশাকর রাখতে হবে — এটা তাঁর মতে ঘোর আহাম্মুকি। অথচ পিতৃদেবকে তো গলা চড়িয়ে আহাম্মক বলা যায় না। তাঁর নাম রেখেছেন স্বয়ং তাঁর পিতৃদেব। যাই হোক, জ্ঞান হওয়া-তক সেই যে নিশাকরবাবু আপন নামের ওপর বিরূপ হয়ে আছেন সেটা এই চুয়ান্ন বছর বয়সেও গেল না। বিরূপতার বাতিকটা বরং বয়সের দোষে ইদানিং বেড়েছে।

নিশাকরবাবুর নাম দিবাকরবাবু হলে কি-ই বা এমন ক্ষতি হত! সেখানেও গোলমাল বাধিয়েছেন তাঁর পিতৃদেব। তাঁরও নাম দিবাকর। অবশ্য সেজন্যে তাঁকে ঠিক দায়ী করা চলে না। এ-দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন নিশাকরের পিতামহ দিবানাথ আঢ্য। ঠাকুর্দাকে নিশাকরবাবু দেখেননি, তথাপি সন্তানের নামকরণে তিনি যে ঘোর অবিবেচনা দেখিয়েছেন এজন্যে দিবানাথের ওপর তিনি সন্তুষ্ট নন। পরলোকগত পিতামহের সঙ্গে যদি আচমকা দেখা হয়ে যেত, — মানে তাঁর প্রেতের সঙ্গে, — তাহলে বেশ দু'কথা শুনিয়ে ছাড়তে কসুর করতেন না নিশাকরবাবু। হ্যাঁ, প্রেত জেনেও। এমনই তাঁর রাগ।

বন্ধুরা অবশ্য তাঁকে অনেক স্তোকবাক্য শোনায়। বলে, নামে কি-ই বা যায় আসে নিশাকর! নাম তো মানুষ চেনার উপায় মাত্র। আমাদের পাড়ার কুবেরের মতো গরীব লোক দুটি পাবে না সারা গাঁয়ে। ওর বাপকেলে নামের কল্যাণে ওর কি অবস্থা ফিরে গেছে? কোথায় যক্ষপতি মহাধনী কুবের, আর কোথায় আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরনো চাবা! ওর নাম যদি অকিঞ্চন হত সেটা বরং ভাল হত। অকিঞ্চন মানে জানো তো? নিঃস্ব, যার কিছু নেই। আমাদের

কুবেরের তাই অবস্থা। অথচ ওর বাপ এমন নাম রেখে গেল যে সারা জীবন ঠাট্টা শুনতে শুনতে বেচারা নাজেহাল। দেখ ভাই, নামের সঙ্গে মানুষের চরিত্রের মিল থাকাটা ভাল ছাড়া খারাপ নয়। তোমার নাম যদি পলাশকেতন কিংবা ময়ূরবাহন হত সেটা কি ভাল হত? আর নিশাকর নামটা খারাপই বা কিসে! নিশাকর মানে তো চন্দ্র। আমাদের তো ভালই লাগে নামটা।'

নিশাকরবাবু তৎসত্ত্বেও বলেন, 'নিশাকরের চেয়ে দিবাকর নামটা ভাল। আমার বেশ পছন্দ।'

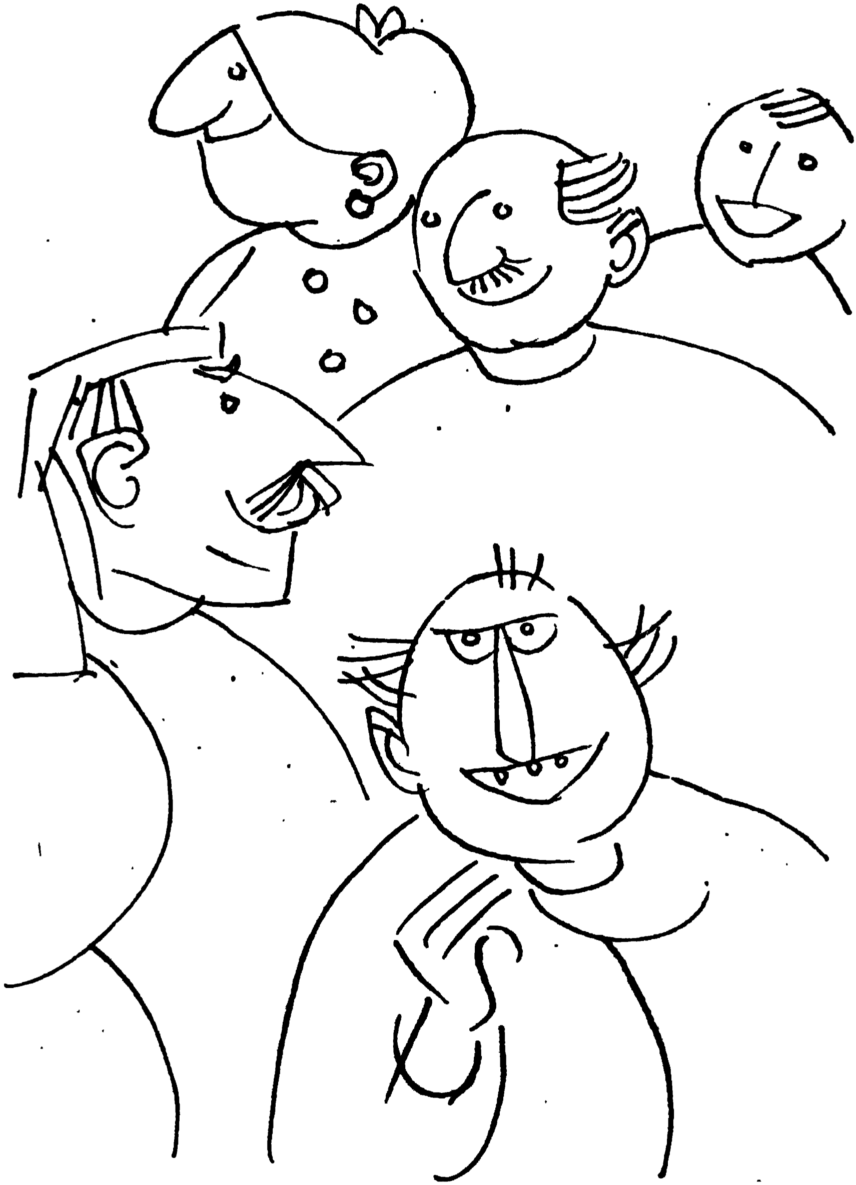
'কিন্তু দিবাকরের ব্যাটা দিবাকর — এতো হয় না। দিবাকর দি সেকেন্ড, দিবাকর দি থার্ড -- এরকম নিয়ম থাকলে আলাদা কথা। আমাদের দেশে সেরকম হয় না।'

বন্ধুদের কথা যে অযৌক্তিক তা নয়, তবু কিছুতেই নিশাকরবাবুর মনোক্লেশ যায় না। তাছাড়া তাঁর নামটা কেমন—সেকেলেও বটে।

তা বাদে তাঁদের ওই পদবীটা। আঢ্য। এটা কি একটা পদবী হল! ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ছেলেরা পর্যন্ত তাঁকে দেখলে দূর থেকে ছড়া কাটে, —

নিশাকর আঢ্য
বড়ই ধনাঢ্য
চেহারায় নেই দার্ঢ্য,
শীতে তাঁর জাড্য।

অবশ্য গলা তুলে ছড়া কাটার সাধ্য ছেলেপিলেদের নেই, কথাগুলো আওড়ায় ওরা নিচুগলায়, তবে তাঁর কানে আসে ঠিকই। নিশাকরবাবু এও বুঝতে পারেন ছড়াটা বাচ্চা ছেলেরা কাটলেও ওটা ওদের মাথা থেকে আসেনি। ছড়াকার অন্য কেউ। এর পেছনে পাকা ব্রেন থাকাই স্বাভাবিক। পাড়ার অনুনয় ছোকরাটাকে তাঁর রীতিমতো সন্দেহ হয়। বার তিনেকের চেষ্টায় স্কুলের শেষ সিঁড়িটা পার হয়ে কলেজে ঢুকছে। চোঙা পাজামা আর কায়দাদুরস্ত পাঞ্জাবি পরে দোদুল চালে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। মাথায় লম্বা লম্বা ঘাড়ঝাঁপা চুল, চোখে পলকা-পাতলা শৌখিন চশমা। ওর কাঁধ থেকে ঝোলানো ব্যাগটা সবসময় বই-টই কাগজ পত্তর ঠাসা। গোপনে গোপনে নাকি কবিতা লেখে। নিশাকরবাবুর ধারণা ছড়াটা বেরিয়েছে ওই ছোকরার কলম থেকেই। এসব ধনাঢ্য, দার্ঢ্য, জাড্য — বিচ্ছিরিরকম কঠিন কঠিন শব্দের মানে নেহাৎ ছোটদের জানার কথা নয়। তিনি নিজে যে জানতেন তাও নয়। হাই স্কুলের শচীন মাস্টারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। কথাগুলোর সবই যে তাঁকে তামাসা করে লেখা সেটাও নয়। সত্যিসত্যিই ধনাঢ্য লোক তিনি। বাগবাগিচা খেতখামার মিলিয়ে বিঘে পঞ্চাশ জমি, পৈতৃক ধনসম্পদও যথেষ্ট। তা এ পর্যন্ত ছড়া-লিখিয়েকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু ওই দার্ঢ্য আর জাড্য! ও শব্দ দুটো সহ্য করা একেবারে অসম্ভব। তাঁর চেহারাটা বেশ গোলগাল, নাদুশ-নুদুশ. একটু আয়েসি ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করেন। সুতরাং তাঁর শরীরে দার্ঢ্য— মানে কিনা দৃঢ়তা নেই। দৃঢ়তা যে নেই সেটা মিথ্যে কথা নয়। শীতকালে বেশ একটু কাবু হয়ে পড়েন বলে কেমন যেন জড়োসড়ো দেখায়,



আর মাথায় বাঁদর-টুপি পরেন বলে খানিকটা কিম্ভূতরকমও লাগে চেহারাখানা। - এসবের একটাও বেঠিক কথা নয়। তা সেজন্যে কার পাকা ধানে মই পড়ল? পড়েনি যখন এত ঠাট্টা কিসের বাপু?

এসব চিন্তা করে নিশাকরবাবুর মাথার গন্ডগোল হয়ে যাবার যো। তাঁর শতকরা একশো ভাগ বিশ্বাস যে মানুষের নাম বা পদবী এমন হওয়া উচিত যা কখনও ঠাট্টা তামাসার কারণ হয়ে উঠবে না।

যাই হোক, নিশাকরবাবু সম্প্রতি একটা গন্ডগোলের মধ্যে পড়েছেন। সেটা হল নাতির নামকরণ। নিজের নামকরণ নিয়ে স্বর্গীয় পিতৃদেবের ওপর কম ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। অথচ আজ নাতির নাম রাখতে গিয়ে নিজেই পড়েছেন ঘোর বিপাকে। তাঁর ছেলেরই নাম দিনকর। এখন দিনকরের ছেলের নাম কি হবে?

দেশে নামের আকাল এখনও অবশ্য পড়েনি · খাদ্যদ্রব্য জিনিসপত্তর দিনে দিনে দেশ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু নতুন নতুন নাম দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে একথা কেউ বলছে না। হরেকরকম নাম গজাচ্ছে রোজ রোজ, শ'য়ে শ'য়ে। চিন্টু মিন্টু বুবুন বুবাই মিতুন পিকলু মিকলু টুকলি বোলান ইল্লি বিল্লি — এসব নাম তাঁর ছেলেবেলায় ছিল না। এসব নামের কি মানে কে জানে! নাম থাকবে অথচ তার মানে থাকবে না এরকম অশাস্ত্রীয় কথা কখনও শোনেননি। তারপর দেখ কিছুদিন আগে পর্যন্ত জেনেছেন রাম সীতা ভীষ্ম অর্জুন কৃষ্ণ — এসব নাকি ভারি সেকেলে নাম। কিন্তু যেমনি টি.ভি. তে রামায়ণ - মহাভারত দেখানো হল অমনি ওসব সাবেকি নাম রাখার হিড়িক পড়ে গেল। তাঁদের গাঁয়ে এখন গোটা তিন শিশু - রাম আর গুটি পাঁচ বেবি-সীতা রয়েছে। অতঃপর যদি কোন বাচ্ছা মেয়ের নাম হিড়িম্বাও রাখা হয় তাতেও তিনি অবাক হবেন না। কে যেন বলছিল মুসলমান পাড়ায় গুটি চার বাচ্ছার নাম সাদ্দাম। কোন্ দেশে যেন এই সেদিন ঘোর যুদ্ধ হয়ে গেল। আর যে লোকটা সাংঘাতিক বীরত্ব দেখাল তারই নাম সাদ্দাম। সেই নামে নাম রাখতে সব উঠে পড়ে লেগেছে। তো এই হচ্ছে দেশের হাল। নামের শেষ নেই, নাম রাখার পেছনে মাথামুন্ডু, কার্যকারণ থাক আর না-ই থাক।

কিন্তু তাঁর নাতির ব্যাপারটা আলাদা। তিনি চান এমন নাম যার শেষে 'কর' শব্দটা থাকবে। পিতৃপুরুষের নামের ধারা বজায় রাখার ব্যাপার আর কি! ওই রবি ঠাকুরদের ফ্যামিলিতে সবার নামের শেষ যেমন 'নাথ', তেমনি আঢ্যি বংশের বংশধরদের নামের শেষে 'কর'। তা সেরকম নামের অবিশ্যি আকাল পড়ে যায়নি। শ্রীকর, অভয়ঙ্কর, শুভঙ্কর ইত্যাদি নাম বাতলে দিয়েছিল তাঁর বন্ধুরাই। কিন্তু এসব নাম তো নতুন নয়, বহুকাল ধরে চালু। কেবল তাঁদে গ্রামখানা খুঁজলেই চারটে শুভঙ্কর, দুটো শ্রীকর এবং অন্ততপক্ষে একটা অভয়ঙ্কর পাওয়া যাবে। নিশাকর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এসব নাম বাতিল করে দিলেন। বন্ধুরা ততটা প্রতিভাবা নয় যতটা সেই ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা ছিলেন যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম দিয়েছিলেন বন্ধুরা হার মানতে নিশাকরবাবু ছুটলেন শচীন মাস্টারের কাছে। ভদ্রলোক ওই স্কুলের উঁ

ক্লাশের ছেলেদের পড়ান। বাংলাভাষায় প্রচুর জ্ঞান — সবাই বলে। প্রায়ই কলকাতা থেকে ডাকযোগে মোটা বই আসে তাঁর ঠিকানায়। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা দেখে মনে হয় সেসব বই তিনি পড়েনও।

সব শুনে-টুনে শচীন মাস্টার আরো কতকগুলো নাম বাতলালেন। শঙ্কর, প্রভাকর, ভাস্কর ইত্যাদি কিন্তু কোনটাই নিশাকরের মনের মতো হল না। শচীন মাস্টার নামগুলোর সন্ধি ও প্রত্যয়ঘটিত অর্থ, এমনকি প্রসঙ্গ এবং তাৎপর্য পর্যন্ত বিশদ করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুই নিশাকরবাবু মনে রেখাপাত করল না। নাতির নামাবলী শুনতে শুনতে তিনি তিন কাপ চা দুটো সিগারেট এবং হাফ-ডজন বিড়ি শেষ করলেন। অবশ্য সবই শচীন মাস্টারের সৌজন্যে। কিন্তু সমস্যার সমাধান এক চুলও এগোল না। শেষাবধি শচীন মাস্টার সাংঘাতিক রেগে গেলেন। তাঁর অসীম জ্ঞানসমুদ্রও যেন শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে নিশাকরবাবুর অপছন্দের তাপে। চোখমুখ লাল হয়ে গেল মাস্টারের।

নিশাকর খানিকটা 'দুয়ো' দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'মাস্টার, এই বিদ্যে নিয়ে ছেলে পড়াও? শব্দের ভাঁড়ার এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল? 'কর-অন্ত্য শব্দ খুঁজে পাচ্ছো না আর?'

শচীন মাস্টার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'পাব না কেন? তস্কর, লস্কর, ভয়ঙ্কর, পুষ্কর, ক্ষেমঙ্কর - 'কর অন্ত্য' শব্দের অভাব কি?'

'তস্কর মানে তো চোরডাকাত! অ্যাঁ! আমার নাতির নামের মানে হবে চোর? মুখ সামলে মাস্টার।' নিশাকরবাবু ক্রোধে তোৎলাতে লাগলেন, 'লস্কর মানে — ওই লোকলস্করের লস্কর তো?'

'হ্যাঁ।'

'ছিঃ-ছিঃ। তুমি এত নিচে নামতে পারলে মাস্টার! আর পুষ্কর মানে? মানেটা ঠিক—'

'ওটা একটা তীর্থের নাম।'

'না, না। ওসব তীর্থ-টির্থ নয়। শুনে কানে আঙুল দিতে হয়। আর পুষ্কর মানুষের নাম হতে পারে? আর ক্ষেমঙ্কর শুনলে তো হার্টের অসুখ হবার যোগাড়।'

শচীন মাস্টার হাত জোড় করে বললেন, 'আমায় ক্ষমা করুন নিশাকরবাবু। বাংলাভাষায় 'কর-অন্ত্য' শব্দ যতো আছে তার প্রায় বারো আনাই বলেছি। আর মনে আসছে না। মাথায় বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার কাছে চারখানা বাংলা ডিক্সনারি আছে। ওগুলো নিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে পারেন। মাসখানের পরে ফেরৎ দিলেও ক্ষতি নেই। এবার রেহাই দিন। আসুন আপনি।'

'আসুন আপনি' আর 'বেরিয়ে যান' প্রায় একই কথা। ভদ্রভাষায় গলাধাক্কা আর কি! নিশাকরবাবু রাগে দ্বিগুন হয়ে শচীন মাস্টারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। মনে মনে বললেন, 'অতি অভদ্র, বেশরম, যাচ্ছেতাই। পাগল আর কাকে বলে!' শচীন মাস্টারও অবশ্য একই ধরণের কথা বললেন বাড়িতে বসে, মনে মনে। সৌভাগ্যের বিষয় কেউ কারো কথা শুনতে পেলেন না। নচেৎ একটা মল্লযুদ্ধ অনিবার্য ছিল।

পথে নেমে নিশাকরবাবু ভাবলেন, একালের মাস্টারগুলো ি রেট মুখ্যু ছাড়া কিছু নয়। ওরে বাবা, লোকে কি সাধে বলে সাতটা গর্দভ মরলে একটা মাস্টার হয়! ঠিকই বলে। নিশাকরবাবু আরো ভাবলেন যে- লোক আড়াই ঘন্টা ধস্তাধস্তি করেও পছন্দসই একটা নাম বেছে দিতে পারে না তাকে নাতির অন্নপ্রাশনে কিছুতেই নেমন্তন্ন করা নয়। হুঁ, নেমন্তন্ন! যাদের মধ্যে পদার্থ নেই তাদের নেমন্তন্ন খাবার অধিকারই নেই। এইসব ভেবে বেশ একটা পরিতৃপ্তি বোধ করলেন নিশাকরবাবু। তাছাড়া, আর কিছু না হোক, গুটি তিন-চার টাকার চা-সিগারেট-বিড়িও ধ্বংস করা গেছে মাস্টারের। তাতেও খানিকটা রাগের উপশম হল নিশাকরের।

কিন্তু এদিকে যে বড্ডো তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে নাতির অন্নপ্রাশনের দিন। ইতিমধ্যে নাম একটা ফিট না করে ফেললেই নয়। তাঁদের পরিবারে নিয়ম আছে নবজাতকের প্রাশনের সময় তার নামকরণ হবে। আর সেটাই চলবে আজীবন। এরকমই হয়ে আসছে বরাবর। তিনি এর অন্যথা করেন কি করে? এদিকে নাতির ঠাকুমার বাক্যবাণে তো তাঁর প্রাণ আইঢাই। বাক্য তো নয়, সে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। সারা শরীরে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দেয়। 'তুমি না হয় বিদ্যে 'গরের বর্ণপরিচয়টাও ভাল করে পড়নি, তাবলে দেশেতো লেখাপড়াজানা মানুষের আকাল পড়ে যায়নি। তাদের দরজায় একটু ধাক্কা মেরে দেখ না'— এরকম সব ছিপটি-মারা কথা।

নাজেহাল নিশাকর ছুটলেন লেখাপড়াওয়ালাদের দরজায়। মহকুমা আদালতের উকিল, অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান, হারু কোবরেজ থেকে শুরু করে উপেন আচার্যি পর্যন্ত কারো কাছে যেতেই বাকি রাখলেন না। লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁর নামে ছড়া লিখিয়ে অনুনয় ছোকরাকে পর্যন্ত পাকড়ালেন একদিন। কিন্তু হায়, দূর গগনের চাঁদামামা যেমন মর্ত্যশিশুর চাঁদকপালে টিপ দিতে আসে না, তেমনি হাজারো সাধাসাধিতেও নাতির যোগ্য নাম ধরা দিল না।

নাম এসে ধরা না দিলেও অসুখ এসে সহজেই ধরা দিল তাঁকে। হাঁটা হাঁটি, দৌড় ঝাঁপ — ওফ্, কি সাংঘাতিক খাটাখাটনিই না গেল তাঁর ওপর দিয়ে! শচীন মাস্টার না হয় গাঁয়ের লোক, কিন্তু কোবরেজ মশাই, অঞ্চল প্রধান কিংবা উকিল সাহেব ভিন্ গাঁয়ের লোক। ইনি এ গাঁয়ের লোক তো উনি সে গাঁয়ের। চরকিবাজির মত এ গাঁ-ও গাঁ করতে করতে এক সন্ধেয় বাড়ি ফিরতে ফিরতে নিশাকরবাবু টের পেলেন শরীরটা টিস্‌টিস্ করছে। কপালে হাত দিয়ে দেখলেন বেশ গরম, আর কানটা কেমন ভোঁ-ভোঁ করছে। চোখেও কেমন জ্বালা-জ্বালা ভাব। কোনরকমে বাড়ি ফিরে সেই যে বিছানা নিলেন, তারপর দিন ছয় আর কিছু তাঁর খেয়াল নেই। প্রায় অজ্ঞান-অচৈতন্য। ডাক্তার এসে বললেন, 'মেন্টাল শক পেয়েছেন। হাইপার টেনশন। প্রাণ হারাবার আশঙ্কা নেই তবে ঘোর কাটতে সময় লাগবে। ফুল রেস্ট দরকার, রোগী যেন বিশেষ একসাইটেড না হয়। নড়াচড়া করতে দেবেন না।'

তা নিশাকরবাবুকে কেউ নড়াচড়া করতে দিল না। দরকারও হল না। কেবল ভুল বকেই তাঁর কেটে গেল কয়েকটা দিন। ভুল-বকুনির মধ্যে তিনি বেশ ক'জন মানুষকে মার্ডার করবেন বলে শাসিয়েছেন। তাঁরা হলেন শচীন মাস্টার, মহকুমা আদালতের উকিল পঞ্চানন চাটুজ্জে,

অঞ্চল-প্রধান ধূর্জটি চাকলাদার, হারু কোবরেজ, উপেন আচার্যি আর কবি অনুনয়।

সাত দিনের দিন খানিকটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে, পরপর দু'গেলাস আদা-তেজপাতা মেশানো চা খেয়ে, নিশাকরবাবু হুঙ্কার তুলে বললেন, 'এই কে আছিস? কই হ্যায়?' নিশাকর যৌবনে কিছুদিন যাত্রা করেছিলেন। রাজা কিংবা নবাব সাজতেন। সেই রাজকীয় কিংবা নবাবী মেজাজ মাঝেমধ্যে মাথা চাড়া দেয়।

গৃহিণী ছুটে এসে বললেন, 'কি হয়েছে?'

'নাতির অন্নপ্রাশনটা যেন কবে?'

'হয়ে গেছে। পরশু দিন।' নাতির ঠাকুমা বললেন।

'হয়ে গেছে! তার মানে?' নিশাকর আর একটা হুঙ্কার দিতে গেলেন। কিন্তু তেমন জুৎ করতে পারলেন না। বরং গলার আওয়াজ বেশ কাহিল শোনাল। মিনমিনে গলায় বললেন, 'আমার নাতির মুখে-ভাত হয়ে গেল, আর আমিই জানতে পারলাম না!'

'তোমার অসুখ করেছিল।'

'হুঁ, তা করেছিল মনে হচ্ছে। না হলে গলাটা এত বসে গেল কেন?' এই বলে কি যেন খানিকক্ষণ ভাবলেন নিশাকর। তারপর শুধোলেন, 'নাতির কি নাম রাখা হল?'

'রত্নাকর।'

'রত্নাকর!' বিড়বিড় করে কয়েকবার নামটা আওড়ালেন নিশাকরবাবু। তারপর মুগ্ধ গলায় বললেন, 'নামটা তো মন্দ নয়। মন্দ নয় কেন, বেশ ভালই। তা কে রাখল নামটা?'

'আমাদের কাজের লোক। দুগ্‌গা মাসি।'

বাড়ির কাজের লোক তাঁর নাতির নাম রেখেছে শুনে তৃতীয় হুঙ্কারটা দিতে গিয়েও সামলে নিলেন নিশাকরবাবু। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, 'যে-ই রাখুক। নামটা ভাল। এরকম একটা নামই খুঁজছিলাম আমি। অথচ অতগুলো লেখাপড়া জানা লোক খামোকা ঘুরিয়ে মারলে। ওদের ঘটে কিছু নেই। নিশাকরের নাতি রত্নাকর। বাঃ, বেশ। রত্নাকর তো বটেই। আমার সব সম্পত্তির মালিক তো ও-ই। আর সম্পত্তি তো রত্নই। দুগ্‌গা মাসির দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিও এমাস থেকে।' একটু থেমে বললেন, 'আর শোন। ওই শচীন মাস্টার, উপেন আচার্য, চাটুজ্জেমশাই — ওদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল নাকি?'

'হয়েছিল।'

'খুব খেয়ে গেল তো?' নিশাকর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'না। ওরা কেউ আসেনি।'

'কেন বলতো?'

'বোধহয় লজ্জায়' নাতির ঠাকুমা বললেন আস্তে আস্তে।

দোনলা বনাম গাদাবন্দুক

রাঘব সরকার যে কাণ্ডটা করে বসলেন সেটাকে একরকম হঠকারিতাই বলা যেতে পারে। বাদাবেড়ের ঝিলটা নিশ্চয়ই তাঁর একার নয়। কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয় এখানে তিনি ছাড়া আর কারও পাখি শিকার করার অধিকার নেই।

ঘটনাটা খুলেই বলা যাক। রাঘব সরকার সম্প্রতি একটি দোনলা বন্দুক কিনেছেন। খাঁটি বিদেশী জিনিস। লোকে অবশ্য বলে আজকাল দেশেই উঁচুদরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হয়।বিদেশী আমদানি উঠে গেছে। রাঘববাবু তা মানতে রাজি নন। তাঁর দোনলাটা আমেরিকার জিনিস,এই তাঁর দাবি। 'নয় নয় করে পনের হাজার পড়েছে', গর্ব করে বলে বেড়ান। অস্ত্রটা যে চমৎকার তা না-মেনে উপায় নেই। একেবারে পালিশ-চকচকে, গা থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে। তা অস্ত্রটা কেনা অব্দি পাখিদের পিছু -পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাঘব সরকার। গ্রামের পাশেই বাদাবেড়ের প্রকাণ্ড মাঠ। পাখপাখালির এই দুর্ভিক্ষের দিনেও সেখানে পাখিদের হাট বসে। বেলে হাঁস, পানকৌড়ি, জলপিপি থেকে শুরু করে সামখোল, বাচকা ইস্তক কি নেই সেখানে! ওদের চেঁচামেচিতে ঝিলটা যাত্রার আসর হয়ে যায়। পাখিগুলো এমনই সেয়ানা যে খাঁটি বিদেশী দোনলাকেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। একটা মরে তো একুশটা 'দুও' দিয়ে পালিয়ে যায়।

পরপর দুটো দিন জলকাদা মেখে ভূত হয়ে সরকার মশায়ের মনটা এমনিতেই ভালো ছিল না। তিন দিনের দিন ঝিলে গিয়ে দেখলেন রোগা সিকলিকে কালো একটা লোক তার চেহারার চেয়েও রোগা কুচ্ছিৎ একটা বন্দুক নিয়ে ঝিলের ধারে সদর্পে ঘুরে বেরাচ্ছে। একটা বেলে হাঁসের দুটো ঠ্যাং লোকটার হাতে ধরা। হাঁসের মুখ থেকে টপ্‌টপ্ করে রক্ত ঝরছে।

সদ্য-সদ্য মারা হয়েছে, এক নজরেই বোঝা যায়। লোকটার মুখেও কেমন একটা মিচকে হাসি। রাঘব সরকারের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'তুমি আবার কে হে?' বেসুরো গলার আওয়াজে লোকটা প্রথমে অবাক হয়ে গেল। তারপর বিনয়ের সঙ্গেই বলল, 'আজ্ঞে, আমি নতীশ পাড়ুই।' নতীশ পাড়ুই! রাঘব সরকার নাক কোঁচকালেন। এরপর পাড়ুইয়ের হাতের লিকলিকে রঙচটা অস্ত্রটাকে দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার হাতের ওই বিচ্ছিরি বস্তুটা কী হে?'

'আজ্ঞে গাদাবন্দুক।'

'ওঃ, সেই মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। নারকেল ছোবড়া ঠাসো, ছর্‌রা পোরো, আগুন লাগাও — আরও যেন কী কী সব ব্যাপার। এসব বন্দুক এখনও চলে?'

'আজ্ঞে। তিন পুরুষ ধরে চলছে।'

সরকার মশায়ের ঠোঁটে ঠাট্টার হাসি ফুটে উঠল, 'কলকাতায় জাদুঘর বলে একটা জিনিস আছে জানো? সেখানে ওটা জমা দিলে লুফে নেবে। আর এই আমারটার মত একখানা কিনে নেবে, বুঝলে?'

নতীশ পাড়ুই ঘাড় নাড়ল, 'বুঝলুম। কিন্তু ওরকম দামী জিনিস কোথায় পাব বাবু? আমাদের এতেই চলে যায়।এই তো দেখুন না কেমন একখানা বাগিয়ে ফেললুম এসেই।' নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়াতে গা-পিত্তি জ্বলে গেল রাঘব সরকারের। বলে উঠলেন, 'ছর্‌রা দিয়ে এমন পারে সবাই। এক গুলিতে পার?'

'আপনার যন্তরটা দ্যান তাহলে, চেষ্টা করে দেখি।'

রাঘব সরকার ডাকাতে গলায় ধমকে উঠলেন, 'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। দোনলার তুমি কি বোঝ হে? ভাগো হিঁয়াসে। যেখানে ভদ্দরলোক পাখি মারতে আসে সেখানে পাড়ুই-ফাড়ুই আসে কোন্ আক্কেলে? পাড়ুই! ছিঃ ছিঃ।'

নতীশ পাড়ুই বিড়বিড় করে বলল, 'আজ্ঞে, এ কীরকম কথা? আপনিও আসুন, আমিও আসি। তারপর যার যেরকম বিদ্যে।' নতীশ আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই রাঘব সরকার বাঘডাঁসার মত গর্জন করে উঠলেন, 'জং বাহাদুর।' বলতে না বলতেই কোত্থেকে যেন ঘাড়ে-গর্দানে জোয়ান একটা নেপালী ছোকরার উদয় হল। পাখি শিকারে বেরোলে সরকার মশাই ছোকরাকে সঙ্গে আনেন, এতক্ষণ আড়ালে ছিল কোথাও। ছোকরার দিকে তাকিয়ে রাঘব সরকার ঘোর নিনাদে বললেন, 'লোকটাকে চিনে রাখ। আবার কখনও ওকে এখানে দেখলে গুণে গুণে তিনটি রদ্দা মারবি, তারপর বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবি।'

'জো হুকুম বড়ে সরকার।' জং বাহাদুর মস্তো একটা সেলাম ঠুকল।

নতীশ পাড়ুই কী বুঝল কে জানে, কথাটি না বলে চলে গেল ঝিলের পাড় থেকে।

ব্যাপারটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল? হঠকারিতা? কিন্তু চিন্তাটা বেশিক্ষণ ঠাঁই পেল না সরকার মশায়ের মনে। তিনি রাঘব সরকার, কলকাতায় তাঁর জাঁকাল ব্যবসা। সেখানে বাড়ি করেছেন, গাঁয়ে তুলেছেন প্রকাণ্ড দালান। জমিজমা তো বিস্তর। শহুরে একঘেয়েমি কাটাতে মাঝেসাঝে গাঁয়ে আসেন। বন্দুকটা কেনা অব্দি পাখি শিকারের নেশাটা চেপেছে। বাড়ির কাছাকাছি অমন ঝিল থাকতে শিকারের নেশা না থাকবেই বা কেন? কিন্তু রাঘব সরকারের এলাকায় নতীশ পাড়ুইয়ের মাথা গলাবার কী অধিকার আছে? অভিযোগটা তাঁর এবং বিচারকও তিনি। সোজা রায় দিলেন, 'না, অধিকার নেই।' বেলে হাঁসগুলোর ওপর চটে গিয়ে এলোপাথাড়ি ক'বার গুলি ছুঁড়লেন এবং দুটো বক মেরে খানিকটা খুশি মনেই বাড়ি ফিরলেন। বকগুলো দেখে সবাই হেসে বলল, 'এ তো গো-বক। গো-বক খেতে নেই।'

রাঘব সরকারের ছেলের নাম সোমনাথ। বয়স বিশ-একুশ, কলেজে পড়ে। কয়েকজন বন্ধু নিয়ে শনিবারের সন্ধেয় গাঁয়ে এসে পৌঁছল। বন্ধুরা খাঁটি শহুরে, গ্রাম দেখার বড় শখ। ছেলেকে ডেকে রাঘব সরকার বললেন, 'তোর বন্ধুরা কী খেতে ভালবাসে রে? পাঁঠার মাংস, মুরগি না মাছ?'

সোমনাথ বলল, 'ওদের পাখির মাংস খাবার খুব ইচ্ছে। বুনো হাঁস টাঁস হলে ভাল হয়।'

'এ আর বেশি কথা কী! বন্দুকটা নিয়ে একবারটি বেরলেই তো ঝামেলা চুকে গেল। তারপর কে কত খেতে পারে দেখব!'

'আমিও তাই বলেছি বন্ধুদের। আমার বন্ধু শেখর খুব ভাল মাংস রাঁধতে পারে। ওই রাঁধবে।

'সে তো ভাল কথা।'

'রোববার সাতসকালেই জং বাহাদুরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন সরকার মশাই। হাঁসেদের বংশ লোপাট করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চোখেমুখে। তারপর সকাল গেল, দুপুর গেল—বেলা আড়াইটা নাগাদ ফিরে এলেন জলকাদা মেখে ভূত হয়ে। জং বাহাদুরের কাঁধে বন্দুক, হাতে কিচ্ছু নেই। সোমনাথ আর তার বন্ধুরা তখন খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে রেডিওতে গান শুনছে। সরকার গিন্নি নাকি সরকার মহাশয়ের বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কাঙাল জেলেকে দিয়ে পাকা রুই ধরিয়ে ছিলেন , আর ছেলের বন্ধু শেখর সে মাছের যে কালিয়া রেঁধেছিল তেমন জিনিস এ বাড়িতে কেউ কখনো খায়নি।

পরের দিনটাও বাদাবেড়ের ঝিলের আবাসিকরা বে-ইজ্জতি করল। আর বুঝি মান বাঁচেনা। সোমনাথের বন্ধুদের মুখের টেপা হাসিটা সরকার মহাশয়ের নজরে পড়ল না এমন নয়। শেষ কালে সোমনাথ বলল, 'তোমাকে আর এত ঝামেলায় যেতে হবে না, বাবা।গাঁয়ে দেশে সব শখ মেটে না মানুষের।'

রাঘব সরকার শুনে গেলেন শুধু । তবে হাল ছাড়বার পাত্র যে তিনি নন, এটা বুঝিয়ে

দিল তাঁর চোখের ভাষা।

সোমনাথের বন্ধুরা দিন পাঁচেক হল এসেছে, আগামী কাল চলে যাবে। সোমনাথ বলল 'আজ বন্ধুরা সব তোমার সঙ্গে বসে খাবে বাবা। এতদিন তো সময় দিতে পারিনি।'

রাঘব সরকার বললেন, 'তা বেশ তো।'

বিরাট দরদালানে আসন পাতা হয়েছে। বন্ধুদের নিয়ে বাবার সঙ্গে বসেছে সেমনাথ।থালার পর থালা আসছে, বাটির পর বাটি। একসময় মস্ত সাবেকী আমলের পল কাটা কাঁসার বাটি এল। মশলাভরা ঝোল কানায় কানায় টলমল করছে। রাঘব সরকার বললেন,'চমৎকার খোসবু ছেড়েছে। মাংস নাকি রে? এমন সন্ধের দিকে পাঁঠার মাংস কোথায় পেলি?'

সোমনাথ বলল,'পাঁঠা নয়, শেখর রেঁধেছে। কেমন সোয়াদ হয়েছে বল।'

সরকার মশায় ঝোলে মুখ দিলেন, বাঃ চমৎকার। সোয়দটা অন্য রকম ঠেকছে। কিসের মাংস রে?

'বেলে হাঁস।'

বেলে হাঁস! পেলি কোথায়? আমি তো হাঁস মারতে গিয়ে হয়রান হয়ে গেছি।'

একটা লোক বেচতে এসেছিল গাঁয়ে। তার কাছ থেকে কিনলাম। তিনটে ছিল। প্রায় কেজি দেড়েক মাংস হয়েছে।'

'কতো দাম নিলো রে? নিউমার্কেট হলে শ'দেড়েক তো যেতই।'

সোমনাথ বলল, 'লোকটা ভারী মজার। দামই নিল না, বলল, তোমার বন্ধুদের খেতে দিলুম! আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছে, দাম নিলে নিন্দে করবেনা! তাই ঠিক কিনেছি বলতেও পারছি না।'

রাঘব সরকারের মাংস চিবানো বন্ধ হয়ে গেল। বললেন, 'কলির যুধিষ্ঠির! অদ্ভুত লোক তো! কেমন দেখতেরে লোকটাকে?

'খুব রোগা আর কালো। নাম বললে-নতীশ পাড়ুই।'

'নতীশ পাড়ুই! বিড়বিড় করে বললেন। রাঘব সরকার। পল কাটা কাঁসার বাটিটার তখন অর্ধেক খালি হয়নি। সেটা আর খালি হলো না। নতীশ পাড়ুইয়ের নামের সঙ্গে হাঁসের মাংসটা মিশে বাটিটাকে কেমন অচ্ছুৎ করে দিয়েছে।

রাঘব সরকার এখন বেড়াতে যান, কিন্তু দোনালা বন্দুকটা কেউ কোনো দিন তাঁর হাতে দেখেনি। শোনা যায় একটা সাবেক আমলের গাদা বন্দুক কেনার জন্যে তিনি জোর তল্লাশি চালাচ্ছেন।

মানুদার ঘেঁটুপুজো

এক সন্ধেয় হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল এবারের ঘেঁটু পুজোয় নেতৃত্ব দেবে মানুদা। আজকাল সব ব্যাপারেই নেতা থাকে, ঘেঁটু পুজোতেই বা থাকবে না কেন ? কিন্তু মানুদার প্রস্তাব শুনে আমরা এমন অবাক হয়ে গেলাম যে সে বলবার নয়। অবশ্য অবাক হবার সেই সবে শুরু।

ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার।

গ্রামের নদীর ধারে খেলার মাঠ। একটা বড়, একটা ছোট। আমরা ছোটরা, মানে রতন, গাবলু, ভুতো, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ছোট মাঠটায় খেলি। আর মানুদা অ্যান্ড কোং যথারীতি বড় মাঠটাতে খেলে। সময়টা ফাল্গুনের মাঝামাঝি। দক্ষিণে হাওয়া দিচ্ছে। আমরা টেনিস বল খেলি। খেলার নামে ঘন্টাখানেক বল-পেটাপেটি করে চমৎকার হাওয়ায় ঘামভেজা শরীর জুড়োচ্ছি—হঠাৎ মানুদা দলছুট হয়ে আমাদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়ে ধপ করে ঘাসের ওপর বসে পড়ল আর বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে শুধোল, 'এটা কি মাস রে ?'

প্রশ্নটা কাউকে নয়, আবার সবাইকেই। কিন্তু উত্তর দেবে কে ? মানুদার নাটুকে আবির্ভাবে আমরা এতই রোমাঞ্চিত যে প্রথম ধাক্কাটা সামলাতেই কেটে গেল কিছুক্ষণ। মানুদা পাড়ার হিরো। জমিয়ে দুর্গাপুজো উপলক্ষে থিয়েটারের বন্দোবস্ত করা, ওয়ান-ডে-ক্রিকেটের মোড়লি থেকে আরম্ভ করে শীতের দিনে বাইরে থেকে আর্টিস্ট এনে বিচিত্রানুষ্ঠান করা পর্যন্ত সব কিছুতেই ওর প্রতিভার ছাপ স্পষ্ট। কিছুদিন আগে নদীর ওপারের বন থেকে একটা বাঘরোল ছিটকে এসে গ্রামের হাঁস-মুরগীর ওপর ভারী হামলা করছিল। মানুদা একা স্রেফ একখানা লাঠি দিয়ে সেটাকে পিটিয়ে লাশ বানিয়ে পাড়ার বাচ্ছাদের কাছে রবিনহুড বনে গিয়েছে। তো এহেন মানুদা কৃপা করে আমাদের মধ্যে শুধু আসেইনি, এসে জানতে চেয়েছে এটা কি মাস!

গাবলু আমাদের মধ্যে বেশ সাহসী আর চটপটে। মানুদার শিহরণ জাগানো আবির্ভাবের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সে-ই প্রথম বলে উঠল, 'এটা ফাল্গুন মাস, মানুদা।'

মানুদা কিরকম যেন উদাস হয়ে গেল। বলল, 'ফাল্গুন! তোদের রবিঠাকুর এই মাস নিয়ে কি যেন একটা কবিতা লিখেছে না ? ফাল্গুনে বিকশিত— বিকশিত—'

বিদ্যুৎ পড়াশোনায় ভাল। সে বলে উঠল, 'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল, ডালে ডালে পুঞ্জিত—'

'ব্যস, ব্যস, হয়েছে।' মানুদা হাত তুলে বিদ্যুৎকে থামিয়ে দিল,'ফাল্গুনে ফুল ফোটা ছাড়া আর কি ঘটে রে ? এই সময়েই তো ঘেঁটু পুজো হয়, না ?'

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, মানুদা। সামনেই তো ঘেঁটু সংক্রান্তি।'

'তোরা ঘেঁটু পুজো করিস ?'

ভুতো সবার হয়ে বলল, 'আগে করতাম। এখন বড় হয়ে গেছি না, তাই আর করি না। এখন তো ও-পাঠ উঠেই গেছে। চাল-পয়সাও লোকে তেমন দিতে চায় না।'

মানুদা একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'একটা পুজো উঠে যাচ্ছে, এটা কি ভাল কথা ? কেন, ঘেঁটু কি দেবতা নয় ? বরং ঘেঁটু হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দেবতা। ঘেঁটু পুজোর [illegible] কে ? না শিব। এহেন দেবতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত কি ?' আমাদের মুখের ওপর একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে মানুদা বলতে থাকে, 'উচিত যে নয় সে তো তোদের মুখের চেহারাই বলে দিচ্ছে। সুতরাং ঘেঁটু পুজো হবে এবং করব আমরা সকলে মিলে।'

সকলে মিলে মানে! আমরা আড়চোখে তাকালাম পরস্পরের দিকে।

মানুদার ঠোঁটে ভারি পবিত্র হাসির আভাস ফুটে উঠল। বিনয়ী বৈষ্ণবের হাসি। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস। আমরা মানে তোরা এবং আমি। তোদের [illegible] হিসেবে সঙ্গে থাকব। গোটা ব্যাপারটা পরিচালনা করতে পাকা মাথার একজনকে দরকার। এ শর্মা থাকতে ভাবনা কিসের ? আর একটা কথা। বহুদিন জমিয়ে ফিস্ট হয়নি। এই উপলক্ষে সেটাও হয়ে যাবে। যাকে বলে সর্বজনীন ফিস্ট। তাতে দলের ছেলেরাও থাকবে, আর তোরা তো আছিসই। এবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটায় আসছি। ঘেঁটু পুজোয় শিবই তো আসল। উপযুক্ত শিব কেউ না থাকলে লোকে চাল পয়সা দেবে কেন ? তা সে সমস্যাও মিটে গেছে। আমি যখন আছি শিব সাজার কর্তব্য আমারই পালন করা উচিত।'

শিব সাজা! কর্তব্য! শব্দগুলো কেমন যেন ভ্যাংচাতে লাগল আমাদের। ভয়ে ভয়ে মানুদার দিকে তাকালাম। বাইশ থেকে বত্রিশ যে কোন একটা বয়স হতে পারে মানুদার। সিড়িঙ্গে লম্বা শরীর, লম্বা জুলফি, গাল বসে যাওয়া মুখ— এই চেহারায় শিব সাজলে রীতিমতো দর্শনীয় ব্যাপার হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকের মুখে হাত চাপা দেবার উপায় তো আমাদের হাতে নেই। সাংঘাতিক একটা হাসাহাসির ব্যাপার হবেই। তাছাড়া বিদ্যুতের ছোটকাকা মানুদার

সঙ্গে এক ক্লাশে পড়েছে আমরা সবাই সেটা জানি। এই বয়সে শিব সাজবে মানুদা?

গাবলু কি যেন বলতে গেল। মানুদা মাছি তাড়াবার মতো করে ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি থিয়েটার করি, এটা ভুলে যাস না। মেক-আপের বিদ্যেটা ভালরকমই শেখা আছে।'

রতন সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'তুমি শিব সাজলে কেমন দেখাবে না!'

'ক্যালেন্ডারের ভুঁড়িওয়ালা পুজুরি বামুনের মতো চেহারার ছবি দেখে বলছিস তো! শিব তো আসলে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, মানে গাঁজাখোর। ড্রাগ খাওয়া লোকে কখনও স্বাস্থ্যবান হয় না, বুঝেছিস?'

বুঝবার কি-ই বা ছিল! অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার মানুদাকে থামানো যাবে না, জানি। এবং গেলও না।

দেখতে দেখতে এসে গেল ঘেঁটু সংক্রান্তি। মানুদা বিকেল থেকে রঙ তুলি নিয়ে বিস্তর ধস্তাধস্তি করল। কিন্তু কোথায় শিবের ইমেজ আর কোথায় মানুদা? ওই ল্যাকপেকে চেহারায় রঙ মেখে সং সেজে, কানে ধুতরো ফুল গুঁজে আর হাতে সত্যিকারের একটা কল্কে নিয়ে যখন শিবের রূপসজ্জায় রাস্তায় নামল তখন সে এক দেখবার জিনিস। আমাদের গ্রামটা মস্ত, নটা প্রকান্ড পাড়া আছে বলে গ্রামের নাম নওপাড়া। তা সব পাড়ার গেরস্থরা মানুদাকে চেনে না। তারা শিব ঠাকুর দেখে এমন আশ্চর্য হয়ে গেল যে চাল পয়সা দিতে ভুলে গেল। হাসাহাসি, গা-টেপাটেপি— সে এক বিচ্ছিরি কান্ড।

মানুদার দুর্ভেদ্য রূপসজ্জা ভেদ করে কেউ কেউ চিনেও ফেলল তাকে। নিবারণ সামন্ত মস্ত চাষী। ধান আর রবিফসলে সম্বৎসর গোলা বোঝাই। বলল, 'তুই আমাদের মানু না? এই বয়সে শিব সেজেছিস! আগে আলু ডালু খেয়ে মোটা হ', তারপর শিব সাজবি।'

পশ্চিমপাড়ার বিপিন মন্ডলের প্রকান্ড সব বাগানবেড় আছে। লোকটা কাউকে কেয়ার করে না। বলল, 'মা অন্নপূর্ণা কি ভাল করে খেতে দিত না হে তোমাকে? দিনকতক পেঁপে কাঁচকলার ঝোল খেয়ে শরীর বাগিয়ে শিব সেজো হে নটবর।'

সবার ওপর গেল পঞ্চুপিসি। বুড়ি গাঁ-সুদ্ধ সবার পিসি। গলায় যেমন ঝাঁঝ, তেমনি দাপট। অমন দজ্জাল মহিলা এ তল্লাটে কেউ নেই। শিবকে দেখে গালে হাত দিয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ— ঠাকুরদেবতা নিয়ে এরকম তামাসা! শিব না বেবো কাঠ! তা বাবা শিব, বহুদিন মাছ মাংস জোটেনি বুঝি!'

আশ্চর্য! মানুদা যেন উদাসীন দার্শনিক, নাকি বৈরাগী শিব নিজেই! ওর অঙ্গের বিভূতির ওপর দিয়ে সব গঞ্জনা যেন পিছলে গেল। দু'একবার ওর দাঁতে দাঁত ঘষার আওয়াজ যদি কানে এসে থাকে সে নিশ্চয়ই আমাদের শোনার ভুল!

তিন রাত্রির মাধুকরীর মোট ফল দাঁড়াল পাঁচ কেজি চাল, দু'কিলো আলু আর খুচরো পয়সায় এগারো টাকা। এতে গ্র্যান্ড ফিস্ট কেন, কোন ফিস্টই হতে চায় না। অথচ মানুদার

সর্বজনীন ফিস্টে সাকুল্যে চল্লিশজন মেম্বার দাঁড়াচ্ছে।

'ভিক্ষার চালপয়সা যা উঠেছে তাতে তো কুলোবে না মানুদা'-- বললাম আমরা।

মানুদাকে কিন্তু আদৌ চিন্তিত দেখলাম না। বলল, 'ডরো মৎ। সব ঠিক হয়ে যাবে। শিব তার অনুচরদের মুস্কিলে ফেলবে না। আমার ওপর যখন নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিস ঘাবড়াবার কিছু নেই।

নেতাদের রকমসকম বোঝা আমাদের কর্ম নয়। ওরা কোথা দিয়ে কি যে করে ওরাই জানে। মানুদাও কোথা দিয়ে কি করল মানুদাই জানে। শুধু এটুকু বলতে পারি যে, ফিস্টের দিন সন্ধেয় মানুদা ঘণ্টা দেড়েকের মতো আমাদের মধ্যে ছিল না, বড়দের দলের দু'তিনজনকে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল। তা যোগাড় যন্তরের ভার যখন ওরই ওপর তখন ওকে বাইরে ছোটাছুটি তো করতেই হবে।

খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন বেশ ভালই হয়েছিল স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য কম্বিনেশনটা অদ্ভুত। ভাত ডালের সঙ্গে প্রচুর কাঁচকলা ভাজা, কুমড়ো ভাজা, মাংস আর পেঁপের তরকারি। কিন্তু আয়োজন এত অঢেল যে চল্লিশ জনের পক্ষেও বড্ডো বেশী।

মানুদার সুদক্ষ নেতৃত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এতসব যোগাড় করল কি করে? মা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার থেকেই এল নাকি এসব?

রহস্যের উত্তর মিলল ফিস্টের পরের দিনই। খবর ছড়িয়ে পড়ল সাত সকালেই। নিবারণ সামন্তর আলুক্ষেতের অন্তত দু'মন আলু নিপাত্তা। বিপিন মন্ডলের বাগানবেড়ে পেঁপেগাছ বেবাক ফাঁকা— কাঁচকলার কাঁদি একটিও নেই। আর বাবা পঞ্চানন্দর কাছে মানত করা পঞ্চুপিসির নধর দশসেরী পাঁঠাটা বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে। সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে মানুদাকে। বিশেষ করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পঞ্চুপিসি।

কিন্তু কোথায় মানুদা?

খবর নিয়ে জানা গেল মানুদা গ্রামেই নেই। কাকভোরে উঠে মাসির বাড়ি চলে গেছে। মাসির বাড়ি অন্য জেলায়, আমাদের গ্রাম থেকে অন্তত দশক্রোশ। মাসিদের গ্রামে নাকি জাঁকজমক করে গাজন হয়। মানুদার মা বলল, মাসি নাকি পইপই করে গাজন দেখতে যেতে বলেছে।

তা হবে। কিন্তু চৈত্রী গাজনের তো এখনও ঢের দেরী। আর মানুদার হঠাৎ কেন মাসির বাড়ি যাওয়ার নিদারুণ দরকার পড়ে গেল তা আমাদের চেয়ে কে-ই বা বেশি জানে।

আজব আপ্যায়ন

পুরনো আমলের লোকদের মুখ থেকে সাবেক কালের গল্প শুনতে সবারই মজা লাগে। মান্ধাতার যুগের ব্যাপার বলে নাক সিঁটকানোও যায়, আবার তারিয়ে তারিয়ে উপভোগও করা চলে। এসব গল্প হরেক রকম। তবে খাওয়া-দাওয়ার গল্পই বেশি। সাবেকী লোকেরা বলবেই যে তারা এই খেয়েছে, ওই খেয়েছে, সেই খেয়েছে। আর সে-সবের কি-ই বা রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ, স্বাদ আর আকার-আকৃতি! না, একালে সেরকম জিনিস হয় না।

আশু ঠাকুর্দার মুখে তাঁর কাঁচা বয়সের গল্প শুনতে আমরা খুব ভালবাসতাম। সে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা। ঠাকুর্দার তখনই ষাট ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তাঁর ছেলেবেলার গল্প মানে আজ থেকে পঁচাত্তর-আশি বছর আগেকার ব্যাপার। তা একদিন আমরা বললাম, - অনেক গল্পই তো হলো ঠাকুর্দা। এবার একটা অন্যরকম গল্প বলুন। আপনারা তো কত ভালমন্দ খেয়েছেন, তাই নিয়ে গল্প। আমরা তো ভাল জিনিস চোখেই দেখতে পাই না।

ঠাকুর্দা খুশি হয়ে বললেন, — আচ্ছা, বলছি। সে কালটাই ছিল অন্যরকম। মেজাজটাই ছিল আলাদা। ভূমিকা না করে গল্পটাই বরং বলি। তবে এটা গল্প নয়, ঘটনা। এতে আমি নিজেও জড়িয়ে পড়েছিলুম। এটাতে হাস্যরস, করুণরস, বীররস — সবই আছে। শোনো তাহলে।

দ্যাখো, আগেকার দিনের লোকেরা খেতে খুব ভালবাসতো। এখনকার দিনের মতো অম্বল - অম্বল বাতিক তখনও ওঠেনি। কথায় কথায় হজমের ওষুধ খাওয়ার রেওয়াজও চালু হয়নি। এক কুড়ি দিশি আম লোক চাখতে চাখতে শেষ করে ফেলত। আমি নিজেও খেতে পারতুম খুব। বলতে কি, খাবার নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠতুম। সেবার হয়েছে কি, পাড়ার বিয়ে, অবস্থাপন্ন গেরস্থ বৈদ্যনাথ জ্যাঠার ছেলে তারকনাথের বিয়ে। শোনা গেল বিয়েও হচ্ছে ভাল বাড়িতে। মেয়ের বাপের অবস্থা যাকে বলে— দুয়োরে বাঁধা হাতি। প্রচুর জমিজমা, বাগানবেড়। ধানের মরাই, পুকুরের মাছ, পোষা গোরুর দুধ — কোন কিছুর অভাব নেই। বরযাত্রী কারা যাবে তারও খসড়া করে ফেললেন মোড়ল-মুরুব্বিরা, আমরা যারা ইস্কুলের



এক ক্লাসের দিকে পড়তুম তাদের ভেতর থেকে জনা পনেরোকে বেছে নেওয়া হলো। তার ভেতরে আমিও রয়ে গেলুম।

তবে বরের কথা শুনে একটু দোটানায় যে পড়িনি তা নয়। তারকনাথের হবু শ্বশুরের দেশ নাকি অন্তত সাত ক্রোশ দূরে। গাঁয়ের লোকের দূরত্বের হিসেব কখনও মেলেনা। সাত ক্রোশ বললে আট-ন' ক্রোশ ধরে নিতে হবে। গ্রামাঞ্চলে বাস-রিক্সার চলন তখনও হয়নি। হাঁটা পথ। ঘন্টা পাঁচেকের ধাক্কা। অতখানি রাস্তা হাঁটার ধকল কি সহ্য করতে পারব আমরা? বদ্যিনাথ জ্যাঠা অভয় দিয়ে বললেন,— ঘাবড়াবার কিছু নেই। একরাশ মানুষ — গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে, হাঁটার কষ্ট টেরই পাবে না। কষ্ট হলেও খাওয়া-দাওয়ায় পুষিয়ে যাবে। বেয়াইমশাই নিজে আমাকে বলেছেন, প্রচুর আয়োজন থাকবে। মাছ-মিষ্টি যে যত খেতে পারে। খাইয়ে লোক বেশি-বেশি করে নিয়ে যেতে বলেছেন। দীঘির মতো পুকুর আছে দুটো। তাতে সিঁদুর-রঙা প্রকান্ড প্রকান্ড রুই আর রুপোর বাটের মতো কাৎলা সব সময় জলের ওপর উলটি-পালটি খায়। মেয়ের বিয়েতে খরচ করবেন বলে জিইয়ে রেখেছেন। ভোজ যাকে বলে জব্বর রকমই হবে।

এরপর আমাদের মনে হতেই পারে,-সাত ক্রোশ রাস্তা! ফুঃ, ও আর এমন কি! মোট কথা, দূরত্বের ব্যাপারটা আমলই পেল না। সন্ধে ঘনাবার আগেই বেরুনো হয়েছিল। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল এ-রাস্তা কোনদিনও ফুরোবে না। সাত নয়, অন্তত ক্রোশ আটেক। একনাগাড়ে এতটা যাওয়া কতটা কষ্টকর তার বর্ণনা দেব না। জেনেশুনে যখন বেরিয়েছি পথকষ্ট মেনে নিতেই হবে। কিন্তু কনেপক্ষের ব্যবহার দেখে সবাই খুব দমে গেল।

আমাদের দলে আশি-পঁচাশি জন লোক। যাওয়া মাত্র সাড়া পড়ে যাবে, আসুন-বসুন করবে, তার বদলে কোথায় কি! আমরা যে অতগুলো লোক এত রাস্তা ঠেঙিয়ে গেলুম-যেন গেরাহ্যিই নেই। না করেছে বসার ব্যাবস্থা, না এল কেউ অ্যাপায়ন করতে। ছোট্ট একটা ঘরে চট পাতা, তাতে সাকুল্যে বিশ- তিরিশ জন আঁটতে পারে। বাকিরা আর কি করে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। আধ ঘন্টাটাক পরে কাঁচের গ্লাসে সরবত এল। লেবু-চিনি মেশানো একটি বস্তু! তাতে পচা পচা গন্ধ। নাক টিপে সবাই তাই খেলে।

অথচ এদিকে দিব্যি বাড়ি-ঘর। বড়ো সড়ো উঠোন। চট দিয়ে ঘিরে একপাশে রান্নাবান্না চলছে। বেশ সুগন্ধ উঠেছে। কেষ্টনগর থেকে কারিগর এনেছে শোনা গেল। পাড়ার লোকজন আসছে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা যে এলাম কারো হুঁশ নেই।

বরযাত্রীদের মধ্যে আমাদের চেয়েও বয়সে ছোট কজন ছিল। তাদেরই বেশী কষ্ট। খিদেয় বেচারারা কাহিল। তখন দেশে সবে চা-এর চল হয়েছে। খেতে কিছুটা দেরি হবে, ততক্ষণ চা না হয় দিক। আমাদের গোপালকাকা ওদের একজনকে ডেকে বললেন,—খাওয়া যখন হবে তখন হবে। এখন একটু চায়ের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

ওদের সেই ভদ্রলোকের চেহারা বেশ দশাসই। তেমনি স্বাস্থ্য। চায়ের কথা শুনে ভদ্রলোক এমনভাবে তাকালেন যেন গোপালকাকা কিছু অপরাধ করে ফেলেছেন। বললেন,—চায়ের

পাট এদেশে নেই তেমন। চা খেতে হলে সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং খাড় বেড়ের বাজারে যেতে হবে। সেটা এখান থেকে তিন মাইল।

এ আবাব কি রকম কথা রে বাবা! গোপালকাকা তো অবাক। তবু বললেন,-বিয়ে বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা নেই, সে কি মশাই!

—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! চা খেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য লাভ হয় না। আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন না। আমি চা খাই না। চায়ের গন্ধ শুঁকলে অসুস্থ বোধ করি। বুঝেছেন?— বললেন ভদ্রলোক।

গোপালকাকা বললেন, বুঝেছি। তাহলে একটু জলমিষ্টির ব্যবস্থা করুন। নাহলে বাচ্চা গুলো কষ্টপাবে। ভদ্রলোক প্রায় খোঁকিয়ে উঠলেন,-বেশি খাই খাই করবেন না তো! ওটা খুব খারাপ স্বভাব।

ভদ্রলোকের কথা শুনে তো আক্কেল গুড়ুম! গোপালকাকা ঠাণ্ডা মানুষ। এবার রেগে গিয়ে বললেন,—আপনি কনেপক্ষের কে, জানতে পারি কি?

পারেন। আমি কনের কাকা।

গোপালকাকা একটু নরম হয়ে বললেন,-তা হলে তো ঠিক লোককেই ধরেছি। দেখুন আমরা তো বহুদূর থেকে এসেছি। হাঁটাহাঁটিতে খিদে বাড়ে সে তো জানেনই। তার উপর রাতও বারোটা পেরিয়ে গিয়েছে। জল মিষ্টি, চা নাই দিন, বরযাত্রীদের বসাবার ব্যবস্থাতো করুন!

কনের কাকা গম্ভীর গলায় বললেন,-ঘন্টাচারেক দেরি হবে। গোপালকাকা কোনো রকমেএতক্ষণ নিজেকে সামলে রেখেছিলেন আর পারলেন না। চেঁচিয়ে উঠে বললেন,-- তার মানে?

কনের কাকা নির্বিকার গলায় বললেন,—মানেটা কি বুঝতে পারেন নি? ঘন্টা চারেক মানে ঘন্টা চারেক, তার আগে নয়।

গোপালকাকা সুর নামিয়ে, প্রায় খোসামোদের সুরে বললেন,— বাচ্ছাদের ওপর জুলুম হচ্ছে না! ওদের বসিয়ে দিলে কেমন হয়?

— খুব খারাপ হয়। আমাদের অঞ্চলে নিয়ম আছে বিয়ে যতক্ষণ না মিটছে ততক্ষণ বরযাত্রীদের ডাকা হবে না। বিয়ের লগ্ন কটায় জানেন?

-রাত তিনটেয়।

-এখন সবে সওয়া বারো। বিয়ে বসবে তিনটেয়। বিয়ে মিটতে আরো ঘন্টাখানেক। তার মানে চারটে। তার আগে কোন অনুরোধ করবেন না। ততক্ষণ ঘুরে-টুরে বেড়ান, বিয়ের আয়োজন পত্তর দেখুন।

গোপালকাকা এবার প্রায় হাহাকার করে উঠলেন,— খেতে খেতে সকাল হয়ে যাবে যে

—সকাল কেন, দুপুরও হতে পারে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে নিয়ম। এর একচুলও নড়বড় হবে না।—মৃত্যুদন্ডের রায় শোনাবার মতো করে কথাগুলো বলে ভদ্রলোক কোথায় যেন চলে

গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে খবরটা চাউর হয়ে গেল বরযাত্রীদের মধ্যে। একে বরপক্ষের একটু বেশি ডাঁটই থাকে, তার ওপরে কনেপক্ষের তাচ্ছিল্য ভাবটা সবারই চোখে পড়েছিল। বরযাত্রীরা বেশ গরম হয়ে উঠল। কিছু কিছু কটু মন্তব্য করে ফেলল কেউ কেউ, আর তা বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। আমাদের দলে বেশ কিছু খাইয়ে লোক ছিল। একজনের নাম 'দশসেরী বৃন্দাবন', আর একজনের নাম' ভুজুনে ভীম'। বৃন্দাবন দশ সের জিনিষ খেতে পারে, ভীমের আহার তার চেয়েও বেশি। সেজন্যই ওরকম নাম। খাবার লোভেই ওরা এত দূর এসেছে। তারা তো পারলে কনেপক্ষকে ছিঁড়ে খায়। তা যখন পারলে না, গালমন্দ করে গায়ের ঝাল মেটাতে লাগল। কে কাকে চুপ করায়! আশ্চর্য, কনেপক্ষের দিক থেকে টুঁ শব্দটি নেই। তারা যেন কানে দিয়েছে তুলো, পিঠে বেঁধেছে কুলো। তখন কি আর জানি, কী ঝামেলা অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে!

যাই হোক, বিয়ে তো একসময় চুকল। রাত তখন চারটে বেজে গেছে। গ্রামাঞ্চলের লোকদের এখন ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়। এমনি সময়ে আমরা ভাবছি বিয়ের ভোজ খাবার কথা। তারও তেমন তোড়জোড় চোখে পড়ছে না। ভুজুনে ভীম আর থধাকতে না পেরে কনের কাকাকে গিয়ে বলল,—মশাই, এখনও কি বরযাত্রীদের খাবার সময় হয়নি?

কাকামশাই সংক্ষেপে বললেন,—তা হয়েছে। ব্যবস্থা হচ্ছে। বিয়ের পাট তো সবে চুকল। সবাই ওদিকে ব্যস্ত থাকায় এদিকটা গুছিয়ে নেওয়া যায়নি। —কতক্ষণে গুছিয়ে নেওয়া যাবে? নাকি এখানে সূর্যোদয় না ঘটলে বরযাত্রীদের খেতে দেবার নিয়ম নেই?— বলল ভুজুনে ভীম।

কনের কাকা ঠান্ডা গলায় বললেন, — ঠাট্টা করছেন বুঝতে পারছি। সূর্যোদয়ের আগেই বসতে পারবেন। সবাইকে আসতে বলুন। আমি দেখি কতদূর কি হলো।

বসার জন্যে ছাদে জায়গা হয়ে ছিল। প্রশস্ত ছাদ। একশো জন একসঙ্গে বসতে পারে, এত বড় ছাদ। আমরা সব একগলা খিদে নিয়ে উপোসী বাঘের মতো ওঁৎ পেতে বসে আছি। লুচি পাতে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। দশসেরী বৃন্দাবন ইশারায় বলে দিলে— তোরা সব এমন ভাবে খাবি যেন জীবনের শেষ খাওয়া খাচ্ছিস। আমরাও ইশারায় জানিয়ে দিলুম—তাই হবে।

পরিবেশন শুরু হলো। পরিবেশকদের হাতে চ্যাঙারি, ঝুড়ি নয়। সাধারণত ঝুড়িতে করেই লুচি নিয়ে আসে, খটকা লাগলেও ভাবলুম এটাই হয়তো এদেশের নিয়ম। কিন্তু এ কি! দু'চার জনের পাতে পড়তেই দেখা গেল জিনিসটা চিঁড়ে। বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল চিঁড়ে। পেছনে দইয়ের ভাঁড় হাতে দুজন লোক। মানে দই-চিঁড়ের ব্যবস্থা! প্রচন্ড সোরগোল উঠল। ভুজুনে ভীম তো বলেই ফেলল,—এ কি বিয়ের খাওয়া, না কি শ্রাদ্ধের খাওয়া!

এই সময় সব গলা ছাপিয়ে কে যেন বাঘের গর্জনে বলে উঠল,—মশায়রা চুপ করুন। আমার একটি নিবেদন আছে।



কারো নিবেদনের গলা যে এমন হতে পারে ধারণা ছিল না। তাকিয়ে দেখি আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন স্বয়ং কনের বাবা. চেহারা কনের কাকার চেয়ে ও দশাসই। প্রস্থেও তেমনি। মাথায় ছোটছোট চুল.গলায় তুলসীর মালা। তিলক কাটলে সাক্ষাৎ বৈষ্ণব বাবাজি। যদিও দস্যুসর্দার বললেই মানায় ভালো। বললেন,—আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন, কিন্তু অবাক হবার কিছু নেই। অপমানটা বরপক্ষই প্রথম করেছে। কিছুলোক এখানে এসেই আমাদের গাঁয়ের নিন্দেমন্দ করতে আরম্ভ করে। এটা নাকি বুনো, অসভ্যদের দেশ। শিক্ষা-সহবৎ জানে না এখানকার মানুষ। আমরা তখনই ঠিক করি আপনাদের একটু সমঝে দেবো। বসার জায়গা, চা-জল মিষ্টি—সব কিছুরই ব্যবস্থা ছিল। আমরা ব্যবস্থাটা একটু পাল্টে দিই। মশাইরা, এ গ্রামের নাম পুরনচক। লোকে বলে ডাকাতে পুরনচক। এ গাঁয়ের সবাই একসময় ডাকাত ছিল। এখন ভদ্রলোক হয়ে গেলে কি হবে, দোষটা রয়ে গেছে রক্তে। তা আমাদের গ্রামে মশাই বিয়ের পরই বরযাত্রীদের খাওয়াবার নিয়ম। আমি অন্তত এ-গাঁয়ের দেড়শো বিয়ে দেখেছি। একই নিয়ম। সে নিয়ম তো আমি ভাঙতে পারি না। সেটা না বুঝে গালমন্দ করেছেন। আপনাদের আপ্যায়নের ত্রুটি কোথাও ছিল না। পুকুর থেকে মাছ ধরিয়েছি। পানাগড়ের ল্যাংচা, লক্ষ্মীপুরের মনোহরা, চালতেখালির রসগোল্লা, মায় ভবনগরের রাবড়ির পর্যন্ত ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু—

এই সময় দশসেরী বৃন্দাবন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল,— তা সে সব কোথায় ?

কনের বাবা সমান হুঙ্কার দিয়ে বললেন, — সব আছে। কিন্তু আপনাদের ভাগ্যে নেই। সে সব খাবে আমাদের গাঁয়ের মানুষ। এ হচ্ছে আপনাদের অসভ্যতার শাস্তি। ডাকাতে পুরনচকে এসে অসভ্যতা করে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। আপনাদের যে উপোসী রাখছি তা তো নয়। ফার্স্ট ক্লাশ দই চিঁড়ে। যত পারেন খান। ইয়া ইয়া সাইজের বাতাসা। সে রকমটি আপনারা চোখেও দেখেননি।

—নিকুচি করেছে বাতাসার। এসব খাবার জন্যে ষোল-আঠারো মাইল হেঁটে এলুম! খাবো না— এই বলে ভুজুনে ভীম উঠে পড়তে যায় আর কি!

—খবর্দার। উঠবার চেষ্টা করলে পুরনচকের মাটিতেই দেহ রাখতে হবে। — কনের বাবাকে তখন আর বৈষ্ণব বাবাজি মনে হচ্ছে না, দস্যুসর্দার বলেই মনে হচ্ছে। গলার আওয়াজে চারদিক কাঁপিয়ে বলতে লাগলেন, — ছেলেপুলেরা সব লাঠি হাতে রেডি হয়ে আছে। যদি এক মুঠো চিঁড়ে কেউ পাতের বাইরে ফেলে দেয়, দু ফোঁটা দইও নষ্ট করে — তাহলে মাথায় লাঠি পড়বে। আমাদের পুকুরে আজো জাল দিলে মাঝেমাঝেই মানুষের হাড় আর মাথার খুলি ওঠে। আরো ক'টা নতুন লাশ না হয় পড়ল। মনে রাখবেন এ গ্রামের নাম ডাকাতে পুরনচক।

কারো মুখে কথা নেই। পেছনে না তাকিয়েও সবাই বুঝতে পারছে সেখানে এক দঙ্গল লোক এসে জড়ো হয়েছে। তাদের হাতে লাঠি। তারা নিরীহ বৈষ্ণব নয়। গোপালকাকা ইশারায় বললেন,— গণ্ডগোল কোরো না, হাত চালাও। অমনি শান্ত-সুবোধ বালকটির মতো

সবাই আহারে মন দিলো। প্রথমে হাত আর চলে না, তারপর সেই হাত কখন যে মেশিন হয়ে উঠল কেউ খেয়াল করেনি। স্বীকার করব যে তেমন সুগন্ধ শালিধানের চিঁড়ে, সুস্বাদু দই আর মধুর মতো বাতাসা জীবনে খাইনি। ভুজুনে ভীম আর দশসেরী বৃন্দাবন তাদের সুনাম রেখেছিল। ওদের চারপাশে ভিড় জমে গিয়েছিল। বলব কি, সবাই তখন দশসেরী বৃন্দাবন আর ভুজুনে ভীম। চিঁড়ে-দই-বাতাসা এই আসছে, এই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে ভাঁড়ারে টান পড়ে গেল। কনের কাকা এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন,—মশাইরা চিঁড়ে-টিঁড়ে সব শেষ। পাকা কলা যদি খেতে চান তো দিতে পারি।

গোপালকাকা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, —বিয়ে বাড়িতে পাকা কলা খাওয়ায়, এমন কথা জন্মে শুনিনি মশায়। তাহলে স্বীকার করুন, বরযাত্রীদের পেট ভরে আপনারা খাওয়াতে পারেননি। শুনুন মশাইরা, আমাদের গ্রামের নাম রাজপুর। এখানকার লোকেরা খুব খেতে পারে। সেজন্যে রাজপুরকে লোকে বলে ভোজরাজপুর। ডাকাতে পুলক নিয়ে খুব তো অহঙ্কার করছিলেন, দেখলেন তো ভোজরাজপুরও কম যায় না। তবে আপনাদের চিঁড়ে-দই আমরা চেটে পুঁছেই খেয়েছি। ভাল না লাগলে ওসব জিনিস এত খাওয়া যায় না।

সবাই চুপ। কনেপক্ষের কারো মুখে কথাটি নেই। লাঠিসোটাধারী ছেলেগুলো পর্যন্ত পোষা খরগোস হয়ে গিয়েছে।

তোরা ভাবছিস গল্পটা এখানেই শেষ। তা নয়। সকালে আমরা যখন ফিরব, মেয়ের বাবা এসে হাত জোড় করে বললেন, —আপনারা দুঃখ নিয়ে যাবেন, এ হতে পারে না। রাতে আপনাদের ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। দুপুরে কেউ না খেয়ে যেতে পারবেন না। গ্রামের বদনাম হোক, এ তো হতে দিতে পারি না। না, কোন কথা নয়। আমার এই আবদারটুকু রাখতেই হবে। সব নতুন করে রান্না হবে। কথা দিচ্ছি, বাসি জিনিস খাওয়াব না।

নিজের চোখেই দেখলুম, সব নতুন করে রান্না হলো। দীঘিতে জাল দিয়ে পেল্লায় পেল্লায় মাছ ধরা হলো। নতুন করে দই-মিষ্টি এল। দুপুরে যা খাওয়া হলো তেমন এলেম খাওয়া জীবনে আর কোথাও খাইনি। লুচির বদলে ভাত —এক কাঠি সরেস খাওয়াই হলো। পাঁচ-সাতজন শুধু বাদ গেল। তারা বর-কনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। দোষের মধ্যে,— বাড়ি ফিরে ভুজুনে ভীম আর দশসেরী বৃন্দাবন গাঁদাল পাতার ঝোল আর গলা-ভাত ছাড়া সপ্তাখানেক আর কিছু খেতে পারেনি।

উপসংহারে ঠাকুর্দা বললেন, —এ রকম খারাপ লোক আজকাল নেই, এ রকম ভাল লোকও আজকাল আর নেই। —তা এই হচ্ছে গল্প।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, —ঠাকুর্দা, গল্প নয়, ঘটনা। আশু ঠাকুর্দা বললেন, —ঠিক, ঠিক! বয়েস হয়েছে ভাই। ইদানিং আর সব কথা ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারি না। কোনটা গল্প, কোনটা ঘটনা খেয়াল থাকে না!

খ্যাপা রতনের গল্প

গাঁয়ে-দেশে খ্যাপা রতনের মতো লোক আজো কিছু কিছু মেলে। খাজুরদ' গ্রামে ওই একজন মাত্রই আছে। অদ্ভুত মানুষ।

বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। কিন্তু মনটা একেবারে শিশুর মতো সাদা-সরল। রতন বিশ্বাস করে না চাঁদে মানুষ গেছে কিংবা হিমালয়ের চুড়োয় মানুষ উঠেছে।

রতন আর কোন পাহাড়ের নাম না জানলেও হিমালয়ের নামটা জানে। আর জানে যে কৈলাস শিখর হিমালয়ের মধ্যেই পড়ে। কেউ হিমালয়ে চড়ার কথা বললেই রতন তৎক্ষণাৎ নিজের নাক-কান মুলে বলে উঠবে, 'ওখেনেই তো কৈলেস গো। তা কৈলেস হচ্ছে শিব-দুর্গার ডেরা, সাক্ষাৎ ভগবান-ভগবতীর বাস। ওখানে মানুষ ঢুকতেই পারবে না। নন্দী-ভৃঙ্গী আছে না। ওরা গার্ড দিচ্ছে যে! ঢুকতে দেবে কেন? এসব হচ্ছে শাস্তরের কথা। শাস্তর অমান্যি করলে পিরথিবীতে পেরলয় হয়ে যাবে না। মানুষ হিমালয়ে গেছে, বিশ্বাস হয় না আজ্ঞে।'

তা এসব কথা বলার হক আছে রতনের। ও বহু শাস্ত্রকথা জানে। কবিগান, তরজা, যাত্রপালা, মনসার ভাসান, কৃষ্ণযাত্রা, লেটো-আলকাপ বিস্তর শুনেছে ছেলেবেলায়। এসব এখন গাঁ-দিগার থেকে একরকম উঠে গেলেও একসময় হাটবাজার-গঞ্জে হত নানা পালপার্বণে। রতন সব জায়গাতেই হাজির থাকত। ওদের পাড়ার নারাণ মালিক তরজার দল খুলেছিল। সেখানে বেশ কিছুদিন মালিক মশাইয়ের সাগরেদি করেছিল রতন। দল কবে উঠে গিয়েছে, কিন্তু অভ্যাসটা যায় নি রতনের। বরং নানা কাণ্ড নিয়ে গান বাঁধা আর পছন্দসই শ্রোতা পেলে তা শুনিয়ে দেওয়া ওর কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মাইল চার দূরে বোষ্টমদের একটা আখড়া আছে। সেখানকার বাবাজিদের সঙ্গে ওর বেশ দহরম মহরম। সময় পেলেই যায়। কীর্তন গানের সঙ্গে রতন ... আখর দেয় তা কান পেতে শুনবার মতো।

রতনের অদ্ভুত একটা স্বভাব হল বিচিত্র সব প্রশ্ন করা। সে-সব প্রশ্নের ঠিকঠিক কোন উত্তর হয় না। আর তাতেই ও খুব মজা পায়। উত্তর মনের মতো না হলে খ্যাপা রতন ছোট ছেলের মতো হাততালি দিয়ে বলে উঠবে, 'জানে না, জানে না। দুও, দুও।' উত্তরদাতাকে বোকা বানিয়ে ওর অপার আনন্দ।

মধ্যিপাড়ার চাঁদু দাস শহরে ভাল চাকরি করে, গ্রামের মধ্যে গণ্যিমান্যি মানুষ। বয়সে অন্তত দশ বছরের ছোট চাঁদুকে রাস্তায় দেখে প্রায় আভূমি প্রণাম করে, কান-এঁটো-করা হাসি হেসে রতন একদিন শুধিয়েছিল, 'আচ্ছা, মা বড় না বাবা বড় চাঁদুদা?'

চাঁদু দাস ভালরকম চেনে রতনকে। এই মুহূর্তে তাকে চাঁদুদা বলছে, পর মুহূর্তে চাঁদু খুড়ো কিংবা স্রেফ 'চেঁদো' বলতে একটুও আটকাবে না। তাছাড়া কোন্ উত্তর যে রতনের পছন্দ হবে সে কেবল রতনই জানে। চাঁদু ভারি বিপন্ন বোধ করে। কেটে পড়ার তাল খুঁজতে খুঁজতে চাঁদু বলে, 'বড়ই জটিল প্রশ্ন। এক দিক থেকে মা বড়, অন্য দিক থেকে বাবা বড়।'

'এ-ও বটে, ও-ও বটে! তা হয় নাকি? এক রকম উত্তর দাও।'

'মা-ই তো বড়। হ্যাঁ, তাই।' চাঁদু দাস ঝাঁ করে বলে বসে।

ব্যস, আর যায় কোথায়? খ্যাপা রতন তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে বলে, 'তুমি কিচ্ছু জানো না। বাবা বড়। শাস্তরেই তো লিখেছে—পিতা স্বগ্‌গো, পিতা ধম্ম—' এরপর গোটা শ্লোকটা নিজস্ব উচ্চারণে আউড়ে যাবে রতন। হাইস্কুলের ধনঞ্জয় মাস্টারকেও একদিন ভারি বিপাকে ফেলেছিল সে। ধনঞ্জয় খুব দাপুটে মাস্টার। ভূগোল পড়ায়। ইয়া ছাতি। হাত-পায়ের গুলি দেখবার মতো। কথায় কথায় বেত চালায়। গলায় বাঘের হাঁকার। ধনঞ্জয় স্কুলে থাকলে অনেকটা দূর থেকে সেটা বোঝা যায়। ছাত্ররা যমের মুখে পড়বে, তবু ধনঞ্জয়ের মুখে নয়। এ নিয়ে মাস্টারের গর্বও খুব। এহেন লোকটিকে একদিন রাস্তায় পাকড়ে রতন তার নিজস্ব স্টাইলে প্রণাম সেরে বিনয়ের অবতার হয়ে বলেছিল, 'আপনার মত শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে কিতাত্থ হলুম। একটি প্রশ্ন ছিল আজ্ঞে। সূয্যি তো পুবে ওঠে, হররোজ ওঠে, কেমন কিনা?'

প্রশ্নের গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে ধনঞ্জয় মাথা নাড়, 'সে তো ঠিক কথা।'

'কথা হচ্ছে সূর্য্যিঠাকুর একদিনও পশ্চিমে ওঠে না কেন?' এই বলে রতন মিটিমিটি হাসতে থাকে।

ধনঞ্জয় মাস্টার খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে আমতা আমতা করে বলে,'এ একটা প্রশ্ন হল?'

'হবে না কেন? আপনি নিজেও তো কত উল্টোপাল্টা কাজ করেন। দোষ যে করে তাকে আস্কারা দেন আর দোষ যে করেনি তার ছালচামড়া তুলে ফেলেন। সূয্যি দেবতা কেন এরকম উল্টো কাজ করেন না।'

ধনঞ্জয় মাষ্টার গ্রাহ্যের মধ্যে রতন আনবে না জেনেও বলে ফেলে, 'ওটা প্রাকৃতিক নিয়ম।'

উত্তর শুনে খ্যাপা রতন ভারি বিরক্ত হয়। ব্যাজার গলায় বলে, 'এ'টা একটা উত্তর হল? ছাত্রদের যা-তা বুঝিয়ে পার পেয়ে যাও বলে আমার কাছে পাবে ভেবেছ? শিক্ষিত ব্যক্তি হলে কি হবে তুমি ঘোর অশিক্ষিত।' রতন 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমেছে। এরপর 'তুই'-তে না নেমে যায়! ধনঞ্জয়ের হাত-পায়ের গুলি ঢিলে হয়ে আসে, বুকের ছাতি ছোট হয়ে যায়। মিনমিনে গলায় কিছু একটা বলে চোখ-কান লাল করে দ্রুত পালিয়ে বাঁচে।

এরপর থেকে হাইস্কুলে ছাত্রদের দেখলেই রতন বলে, 'তোদের ধনা মাষ্টার কিছু জানে না। ওকে এত ভয় করিস কেন?' তা এই হচ্ছে খ্যাপা রতন।

খেটে খাওয়াকে ভারি অপছন্দ করে খ্যাপা রতন। কাজকর্মের একদম ধার ধারে না। জোয়ান বয়সে একবার নদীর চড়ায় গাছ কাটতে গিয়েছিল। প্রকান্ড একটা বাবলা গাছের গুঁড়ি ওর পায়ের ওপর পড়ে। মহকুমা শহরের হাসপাতালে পাকা দেড় মাস শুয়ে থাকতে হয়েছিল। মরল না, কিন্তু ডানপা'টা কমজোরি হয়ে গেল। মানুষ প্রমাণ একটা লাঠি নিয়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই গায়ে-গতরে খাটতে ওর ভারি আপত্তি।

তাই বলে হাঁটাহাটির কমতি নেই। চৌপর দিন গাঁয়ের এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে বেড়ায়। অন্নেরও অভাব হয় না। যেখানে হোক চাট্টি খেয়ে নেয়। সবার দরজা ওর জন্যে খোলা। বয়স ভেদে কাউকে 'মা' কাউকে 'বৌমা' কাউকে 'ঠাকুমা' বা 'দিদি' বলে ডেকে ও শুধু বলে, 'আজ আপনার বাড়িতে অন্নসেবা করব।' বাড়ির দোরে বা উঠোনে কলাপাতায় 'অন্নসেবা' করছে রতন— খাজুরদ' গ্রামের এ এক সুপরিচিত দৃশ্য। গাঁয়ের ছেলেপুলেরা ও'কে ভালোবাসে। না বাসবে কেন? রতন যে অনেক গপ্পো জানে, গান জানে। মজার মজার ঘটনার কথা জানে। আবার ওকে নিয়ে রগড় করেও বাচ্ছাদের সময় মন্দ কাটে না। রতন দিব্যি আছে।

তা বলে কি রতনের মনে দুঃখ নেই? আছে। জমিজিরেত না থাকলেও ওর সংসার আছে। দুটি সন্তান। নেপাল আর দুলাল। আর রতনের বউ। আগে রতনের সামান্য জমিজমা ছিল। কিন্তু আলসে হলে যা হয়—পেটের দায়ে বিকিয়ে গেছে। বড় ছেলে নেপাল ইস্টিশান শহরে ট্রলি চালায়। বাড়ি আসে কদাচিৎ। মাঝে মধ্যে দু'পাঁচ টাকা দিয়ে যায় বাড়ি এলে। কিন্তু আসারও নিয়ম নেই তার, টাকা দেবারও নেই। তাই সংসার চলে কষ্টে সৃষ্টে। রতন সেজন্যে কষ্ট পায়, যদিও সংসার নিয়ে সে মাথাই ঘামায় না। দুঃখবোধটাই ভারি আশ্চর্যের।

রতনের বউটার খুব ক্যাটকেটে কথা। ও বাড়ি ফিরলেই দু'চার কথা শোনায়। কিন্তু সেজন্যে রতনকে কেউ নালিশ করতে শোনেনি। বউ মুখ করলে ও শুধু হাসে। খ্যাপা আর কাকে বলে!

রতনের কাজ নেই, আবার কাজেরও শেষ নেই। মানুষটা পরম বিশ্বাসী কিনা। তা অনেকেরই নির্ভর। কেউ ওকে যদি বলে, 'দু'দিন কুটুমবাড়ি যাচ্ছি, ঘরদোর রইল, একটু দেখে রেখো।' তাহলে সেই গেরস্তের গোয়ালঘরে আস্তানা নিয়ে শকুন চোখ মেলে বাড়ি পাহারা দেবে। দু'মুঠো খাবার জন্যে ধর্না দেবে অন্য বাড়িতে। পড়শিরা যদি বলে, 'বাড়ি পাহারা দিচ্ছ দাসেদের, আর অন্নসেবা হাজরা বাড়িতে!' তাহলে রতন তৎক্ষণাৎ এক গাল হেসে বলবে, 'যখন হাজরা বাড়ি পাহারা দোব তখন দাসেদের বাড়ি অন্নসেবা করব। তাহলেই তো হল!' রতনের সোজা হিসেব।

রতন লোকের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ায় এটা কেউ কেউ পছন্দ করে না। ওর বউও পারে না। একদিন বলেছিল, 'মানুষের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়াতে তোমার লজ্জা করে না!'

রতন এমন মজার কথা কখনও যেন শোনেনি। হেসে কুটি কুটি হয়ে বলেছিল, 'শোন কথা! বিধাতাপুরুষ কপালে যা লিখেছে তা কখনও খণ্ডানো যায়? এই যে তুই আমার বউ হয়ে এসেছিস, এও তো সেই ভাগ্যের লিখন। ভাগ্যের ওপর কথা আছে? রামচন্দ্র ছিল রাজার ব্যাটা। তা চোদ্দবছর বনে থাকতে হল তাকে। রামচন্দ্র দেবতা হয়েও ভাগ্যের লেখা খন্ডাতে পারল? এসব শাস্তরের কথা মানুষ যদি বুঝত!' রতন কথায় কথায় শাস্ত্রবাক্য আওড়াতে ভালোবাসে। ওর বোলচাল শুনে খাজুরদ' গ্রামের হোমিপ্যাথ ডাক্তার গোপাল আঢ্যি বলেছিলেন, 'রতনার পেটে একটু বিদ্যে থাকলে ব্যাটা দার্শনিক হত।'

কিন্তু এমন হাসিমুখ মানুষটা রেগে গেলে একেবারে দুর্বাসা মুনি। এক কাজের বাড়িতে কে যেন ওকে এঁটো কলাপাতা ফেলে দিয়ে আসতে বলেছিল। সে বাড়িতে ও খেলই না। শরৎকালের মেঘবৃষ্টির মতো ওর মেজাজের হদিশ পাওয়া কঠিন। আসলে ওর মান-সম্মানের বোধটাই বিচিত্র।

তা সেবার মল্লিকদের বাড়িতে রতনকে নিয়ে একটা কান্ড হয়ে গেল। আর তাতেই মানুষটা শিকড়ে-বাকড়ে একেবারে বদলে গেল।

প্রফুল্ল মল্লিকের মেজ মেয়ের বিয়ে। মল্লিকমশাই ধনী-মানী লোক। ধানচালের কারবার আছে, গঞ্জে বিরাট গোলদারি দোকান। মেয়ের বিয়েতে দেদার খরচ করবে প্রফুল্ল মল্লিক। বিয়েবাড়ি জমজমাট। লোক-লশকরে গম্‌গম্‌ করছে। রতনও যথারীতি হাজির। অন্তত দু'দিন এখানে ওর 'অন্নসেবা' বাঁধা।

মল্লিকের বড় মেয়েও এসেছে বোনের বিয়েতে। বড় লোকের ঘরের বউ। একগা গয়না। সেসব যেমন ভারী, তেমন চমৎকার। ওর বাচ্চা ছেলেটার গলায় দু'ভরি সোনার হার। ছেলেটাকে রতনের কাছে গছিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বাচ্চাটা ভারি দুষ্টু। একে একটু ভুলিয়ে রেখো রতনদা। বিয়ে বাড়ি তো, আমার অনেক কাজ।'

তো সেই ছেলে অনেকক্ষণ পরে রতন মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল তখন ওর গলা ফাঁকা, হার নেই। মল্লিকের বড় মেয়ে চেচিয়ে কুরুক্ষেত্তর বাঁধিয়ে দিল,'ছেলের হার কোথায় রাখলে রতনদা? হার গেল কোথায় খোকনের?'

'তা তো আমি জানিনে দিদি।' রতন একটু ভড়কে গিয়ে এইটুকু বলতে পারল কোনরকমে। ওর মুখ দেখলে যে কেউ বুঝতে পারত ও সত্যি কথাই বলছে।

কিন্তু তা বললে শুনছে কে? বিয়ে বলে ব্যাপার। কতরকম মেজাজের লোক এসেছে। তারা সবাই তো রতনকে ভালরকম চেনেও না। গালমন্দ, ধমক, শাসানির ঝড় বয়ে গেল। কেউ বললে, 'কষে গোটাকতক গুঁতো দিলেই মুখ খুলবে।' কেউ বললে, 'ছোটলোকে বে আস্কারা দিতে নেই' কিংবা 'ভিখিরিকে এত মাথায় তোলার কি দরকার?' কেউ বললে,'বাইরে ভালো মানুষ সেজে থাকলে কি হবে, ভিতরে ভিতরে শয়তান। দেখতে খ্যাপা, আসলে শেয়ানা।' সবাই প্রায় একমত, 'হার ওই সরিয়েছে।' ঠ্যাঙানি দিলে মুখ খুলবে, এ ব্যাপারেও অনেককে একমত দেখা গেল। নিতান্ত চেনা মানুষ বলে সেটা আর হতে পারল না। মোড়ল মুখ্যিরা রতনকে একপাশে ডেকে বললেন, 'লোভের বশে যদি নিয়েও থাক সেটা কবুল কর।'

রতনের সেই এক উত্তর, 'হারের আমি কিচ্ছু জানি না বাবুমশায়রা। হার আমি নিইনি।'

হার সত্যিই নেয়নি রতন। কিছুক্ষণ পরেই হারটা পাওয়া গেল। বাচ্চার গলা থেকে খুলে কিভাবে যেন পড়ে গিয়েছিল নর্দমার ধারে। একটা ছোট ছেলে সেটা কুড়িয়ে পায়। বড়রা পেলে আর রক্ষে ছিল না।

প্রফুল্ল মল্লিক এসে ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না রতন। আমরা ভুল সন্দেহ করেছিলুম।'

রতন কিছু বলল না, ওর চোখ ছলছল করছিল। মল্লিকের মেয়েও ক্ষমা চেয়ে গেল।

সবাই জানে রতন একটা পাগল-ছাগল মানুষ। কিন্তু কেউ জানল না চোর অপবাদটা ওর বুকে কতখানি বেজেছিল। ভিখিরি, ছোটলোক—এই কথাগুলোও ওকে ভারি কষ্ট দিয়েছিল।

সেদিন দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কত লোক মল্লিক বাড়িতে পেট পুরে খেল, কিন্তু সেই ভিড়ে রতনকে দেখা গেল না। রতন কখন নিঃশব্দে চলে গেছে।

বাড়ি ফিরেও কিছু খেল না। বাড়ির সামনের উঁচু পোতাটার ওপর দু'হাঁটুর ভাঁজে মুখ রেখে বসে রইল তো রইলই। নিজের মনে কি যে ভাবছিল সে ওই জানে। পোতার নিচে দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। ওই রাস্তা দিয়েই ছেলেরা স্কুলে যায়। ছোট ছেলে দুলাল কখন ফিরবে সেই আশায় রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। দুলাল গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলে পড়ে।

বিকেলের দিকে দুলাল বাড়ি ফিরল। হাতে বই-খাতা নেই। বাপকে দেখে কেটে পড়ার

ধান্দায় ছিল, রতন বাঘা হুঙ্কার দিয়ে ডাকল, 'অ্যাই, শোন।' সেই ডাকে চারপাশ যেন কেঁপে উঠল, 'হাতে বই-টই নেই কেন? ইস্কুল যাসনি বুঝি? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

খ্যাপাটে বোকাটে বাপের এমন মূর্তি দুলাল কখনও দেখেনি। ভয়ে ভয়ে বলল, 'পাঁশুদের বাড়ি কড়ি খেলতে গিয়েছিলুম।'

'ইস্কুল যাসনি কেন?'

'তুমি কি বই-খাতা-কলম কিনে দিয়েছ? পড়ব কি? লিখব কিসে?'

রতন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'বই-খাতা কিনে দিলে পড়বি?'

'হঁ। পড়ব বৈকি। পড়তে আমার খুব ভাল লাগে।'

রতন বলতে থাকে, ইস্কুলের মাস্টাররা বলে—'তোর মাথা খুব পরিষ্কার। চেষ্টা করলে অনেক দূর এগোতে পারবি। তোকে উকিল হতে হবে দুলু।'

'উকিল! সে কি বাবা?'

'উকিল অনেক উঁচু দরের বিদ্বান রে দুলু। তুই উকিল হলে তোর বাপকে কেউ অপমান করতে পারবে না, ছোট নজরে দেখতে পারবে না। বিদ্বান মানুষের বাপ হওয়াও মান-সম্মানের ব্যাপার, বুঝলি?'

দুলু কি বুঝল কে জানে! বলল, 'তোমাকে অনেকে অনেক কিছু বলে বাবা। সে সব বিচ্ছিরি কথা। আমি মুখ ফুটে বলতে পারব না। কিন্তু বাবা, উকিল হতে যে অনেক পয়সা লাগবে। আমাদের অতো পয়সা কোথায়?'

'আমি দোব।'

'বাঃ রে, তুমি পয়সা পাবে কোথায়?'

'রোজগার করব। গায়ে-গতরে খাটব। দুঃখ মেহনত করে তোকে পড়াব।'

'তাহলে আমি উকিলই হব। মন দিয়ে পড়াশুনো করব।'

'এই তো ছেলের মতো কথা।'

এরপর থেকে রতন একেবারে বদলে গেল। রতন আগে কাজ কাকে বলে জানত না, এখন সে কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। সে মাটি কাটে, কাঠ চ্যালাই করে, ধান কাটতে যায়। এছাড়া হাজার রকম কাজ করে যাতে দু'পয়সা আসে। পয়সা তার চাই ই। কেউ যদি শুধোয়, 'এত পয়সা পয়সা করিস কেন রতন? আগে তো তোর এ-বাতিক ছিল না।' রতন কথা বাড়ায় না, ছোট্ট করে শুধু বলে, 'ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে যে গো।' রতন আর ছড়া কাটে না, কথায় কথায় শাস্ত্র আওড়ায় না। কারো কাজকর্মের বাড়িতেও ছোটে না। কেউ হয়তো বলল, 'চন্ডী পালের ছেলের বিয়েতে কি খাওয়াই না খাওয়াল। তুই কেন গেলি না রতন?' রতন উদাস গলায় উত্তর দেয়, 'খুব খাওয়াল বুঝি? বাঃ, বেশ।' মোট কথা রতন আর

আগের রতন নেই।

চিরকালের বারমুখো রতন এখন কাজ সেরে সাঁঝ ঘনাবার আগেই বাড়ি ফিরে আসে, ফাঁকা দোরে দুলু পড়তে বসে। রতন পাশটিতে চুপ করে বসে থাকে। লেখাপড়ার সে কিছু বোঝে না। দুলু দুলে দুলে গুন্ গুন্ করে পড়া তৈরি করে। রতন কান পেতে সেই গুঞ্জন শুনে যায়। রতন কেন শোনে আর কি বোঝে রতন ই জানে। খাজুরদ' গ্রামে রাত বাড়ে, প্রথম প্রহরের শেয়াল ডেকে যায়, বর্গক্ষেত্রীদের ঘরে ঘরে পিদিম নিভে আসে— রতন তখনও জেগে। দুলুর ঢুলুনি ধরলে চারধারের স্তব্ধ অন্ধকারকে চমকে দিয়ে রতন চেঁচিয়ে ওঠে, 'অ্যাই দুলু।'

দুলুকে উকিল বানাতে রতন পারেনি। অতোটা পয়সার জোর রতনের ছিল না। কিন্তু দুলুই বর্গক্ষেত্রীপাড়ার প্রথম গ্র্যাজুয়েট। আশপাশের পাঁচ সাতটা গাঁয়ের তফসিলীদের মধ্যে এতটা উচ্চশিক্ষিত দ্বিতীয় জন নেই। ছেলেকে বাইরে যেতে দেয়নি রতন। খাজুরদ' হাই স্কুলে ক্লার্কের চাকরি করে আর সন্ধেবেলায় পাড়ার যত বয়স্কদের লেখাপড়া শেখায়। কেউ কেউ বলেছে, 'ছেলের ভবিষ্যৎটা খেলে রতন? শহরে গেলে মোটা মাইনের চাকরি পেত।'

'ছেলেকে মানুষ করতে চেয়েছিলুম দাসবাবু। ও মানুষই হয়েছে। পয়সা মাথায় থাক।' রতনের উত্তর।

দিনের মনে দিন চলে যায়। রতন এখন বৃদ্ধ। মাথা ভরা সাদা চুল। আজো ওর কাজের কামাই নেই। খ্যাপা নামটা কবেই মুছে গিয়েছে। পাঁচ-সাতখানা গ্রামে কথা উঠলেই লোকে বলে, 'মহাশয় মানুষ।'

গ্রাম বাংলায় এ ধরণের মানুষ ক্রমশঃই কমে আসছে।